চতুর্থ অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আবির্ভাবকাল, জীবন এবং সাহিত্য
বিশেষতঃ ছোটগল্প

ক. ভূমিকা

বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে এমন একটা সময়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যে সময়টি হলো মোটামুটি ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়। এই যুদ্ধ বাঙালীর জীবন যাত্রা - মূল্যবোধকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। এই সময়ে মানুষের জীবনে এক অদ্ভুত অথচ অনিবার্য ভাঙা গড়ার খেলা শুরু হয়। এই ভাঙা গড়াতে একই সঙ্গে গ্রাম এবং শহরের মানুষ এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এর আগে পর্যন্ত সমাজ জীবনে যে একটা ধারা ছিল তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে লাগল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া অবস্থা। অসহায়তা বা চরম সংকটের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে চলতে মানুষ ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে বাঙালীর জীবন যাপন, দৃষ্টিভঙ্গী এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এই সময়কার অনেক লেখকের লেখাতেই দেখা যায় শুধু মাত্র বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ সমস্ত বিপর্যয়কে অসহায় ভাবে মেনে নিচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পেও এই প্রতিবাদহীন, অসহায় অবস্থার চিত্র দেখা যায়।

খ. জীবনকথা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী (১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ)। আর মৃত্যু হয় ১৯৭৫ খ্রীঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর। নরেন্দ্রনাথের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। যে কোন লেখকের রচনাকে অনেক খানি প্রভাবিত করে

তার জন্মস্থান এবং পরিবার। নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই তাঁর অনেক উপন্যাস এবং ছোট গল্পে পূর্ববাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ বারংবার এসেছে। তাঁর আত্মকথা থেকে জানতে পারি যে গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী ছিল তার নাম কুমার। এই নামটি লেখকের কানে মধুর লাগতো। পূর্ববাংলার অন্যান্য ছোট নদী-গুলোর মতোই এ নদীটিও বর্ষায় প্লাবিত হত। কিন্তু দু-একবার বন্যা ছাড়া গ্রামের বাড়ি ঘরে জল উঠত না। কিন্তু সারা বছরই নদীতে জল থাকতো। চৈত্র, বৈশাখ মাসে আর এর অন্য রূপ দেখা যেত। 'পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়।'[১] সদরদি গ্রামে লেখকদের বাস ছিল। যে পাড়াতে লেখকদের যাতায়াত ছিল, সেখানে নানা জাতের মানুষ যেমন চাষী মুসলমান, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায়, জেলে, জোলা ইত্যাদিদের বাস ছিল। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যে লেখকের খুব ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল তেমন নয়। তবে গ্রামের এই প্রকৃতি এবং নানা জাতের মানুষেরা তাদের জীবনযাত্রা তাদের বৃত্তি নিয়ে নরেন্দ্রনাথের গল্পে উঠে এসেছে বার বার।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবার ছিল একান্নবর্তী। এই সংসারের দায়িত্ব ছিল তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্রের ওপরে। অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বলে লেখাপড়া বেশি দূর পর্যন্ত করতে পারেননি, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি এবং তাঁর ভাই দুজনে 'ভাজা' শহরে মুহুরীর কাজ করতেন। গ্রামের মধ্যে তাদের পরিবার বেশ সচ্ছল ছিল। লেখকের পিতা মহেন্দ্রনাথ প্রথমে জগৎমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। জগৎমোহিনীর পর পর কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হয়, এবং তিনি পিত্রালয়ে

থাকাকালীন, আত্মীয়েরা মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহ দেন, ইনি হলেন নরেন্দ্রনাথ ও তার ভাই-এর মা বিরাজবালা। বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথের জন্মদাত্রী ছিলেন ঠিকই কিন্তু জন্মের পরেই সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং কুলগুরুর আদেশে প্রথম পুত্র নরেন্দ্রনাথকে বিরাজবালা তার সপত্নী জগৎমোহিনীকে দান করেন। একেই নরেন্দ্রনাথ মা বলে জানতেন। সে কারণেই জন্মদাত্রী বিরাজবালার মৃত্যুতে তিনি সেভাবে দুঃখ অনুভব করেননি, অনেক বড় হয়ে তিনি এ ঘটনা জেনেছিলেন। তাঁর মতে জগৎমোহিনী-ই তার প্রকৃত মা ছিলেন '... তিনি তো আমার জীবনে অনন্যা, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি মা বলে ডাকিনি, মাতৃস্নেহের স্বাদ একান্তভাবে তার কাছে থেকেই পেয়েছি'[২] নরেন্দ্রনাথ একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন বলে পিতা, ও পিতৃব্যসহ তিনভাই দুই মা, মায়ের মতো অন্যান্য রমনীরা বহু ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং একটি ঘনিষ্ট পারিবারিক জীবনের স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন যার প্রভাব তাঁর কোন কোন গল্প উপন্যাসে দেখা যায়।

নরেন্দ্রনাথের মনে তাঁর বাবার চরিত্র একটি আদর্শ পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র পড়তে ভালবাসতেন তেমনি বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীত শিক্ষা না করলেও মার্গসঙ্গীত রাগসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানও তিনি গাইতে পারতেন। শিশু নরেন্দ্রনাথকে প্রাতকালে সংস্কৃত শ্লোক, সূর্যস্তব, গুরু-বন্দনা, পিতৃবন্দনা শেখাতেন। পিতার জটিল চিঠির মুসাবিদা থেকে নৌকা বাওয়া, গাছ-কাটা পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই দক্ষতা নরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতো, পিতার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

লেখকদের জীবনে এমন অনেক মানুষের প্রভাব পড়ে যারা পরবর্তীকালে লেখকের রচনায় নিঃশব্দে স্থান করে নেয়। এ রকমই মানুষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের জীবনে

অবিনাশচন্দ্র চাকলাদার, যহেন্দ্রনাথের তিনি মামা ছিলেন। এই মানুষটির নানারকম হাতের কাজে দক্ষতা ছিল, শিল্পকর্মের তিনি পারদর্শী ছিলেন কিন্তু সে সব কাজ সংসারের উপার্জনের কাজে লাগতো না। কিন্তু এর আনন্দময় ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গ নরেন্দ্র-নাথের বাল্যজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। এই চরিত্রটি আমরা পাই 'চাকলদার' রচনায়। নরেন্দ্রনাথ তার শিক্ষা সুগৃহে প্রতিবেশী শিক্ষক অক্ষয়কুমার শীলের কাছে শুরু করেন।'[৩] বাল্যজীবনের এই শিক্ষক তার মনে স্থান করে নিয়েছিলেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে এই চরিত্রটি দেখা যায়। অক্ষয়কুমার একজন কীর্তন গায়ক ছিলেন। বাল্যশিক্ষার পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের কাছে এই কীর্তনের সুর মাঝে মাঝে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত, যাকে তিনি স্মৃতির মনিকোঠায় ধরে রেখেছিলেন।

এর পর তিনি মিডল স্কুলের পাঠ শেষ করে ভাঙা হাইস্কুলে ভর্তি হন, এখান থেকে প্রথম বিভাগে মাট্রিক পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে নরেন্দ্রনাথ ভর্তি হন। অর্থনৈতিক কারণে কলেজের ছাত্রাবাসে না থেকে খাওয়া থাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতার কাজ নেন এবং সেই সঙ্গে আই·এ· পড়তে থাকেন, কিন্তু সুভাবে লাজুক নরেন্দ্রনাথ সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য পান নি। এই সময়টি মোটামুটি ভাবে তিরিশের দশকের প্রথমার্ধ। ফরিদপুর তখন নামেই শহর, প্রকৃতপক্ষে মফঃস্বল শহরের কোর্ট কাছারি কেন্দ্রিক আধা নাগরিক আবহাওয়া। 'দোকান বাজার, রাজনীতি, সাহিত্যসভা, উকিলপাড়া, কলেজপাড়া, পুলিশ লাইন, জেলখানা, লাল সুড়কির রাস্তা, কেরোসিনের ল্যাম্পপোস্ট, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘর ঘর শব্দ'[৪] এর মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার স্তর ক্রমে বিস্তৃত হল। বাল্যের সেই ভাঙা সদরদির গ্রামীন জগৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হল শহরবাসী মধ্যবিত্তের ভাড়াটে জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতা। কলেজে পড়াকালীন তিনি সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পান নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়কে। আই·এ· পাশ করার পর তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতায় আসেন বি·এ·

পড়ার জন্য। নতুন বিষয় ইকনমিক্স নিয়ে পড়া শুরু করেন কিন্তু বিষয়টি তিনি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে না পারার জন্য পরপর দু-বছর পরীক্ষায় বসে উঠে আসেন এবং অবশেষে ১৯৩৯-এ বি•এ পাশ করেন। এই সময়টি হল দ্বিতীয়টি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মুহূর্ত। নরেন্দ্রনাথ বি•এ পাশ করে ১৯৩৯-এ চাকরী পেয়ে যান।

নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয় বাল্য বয়সেই। তিনি নিজে সেই বর্ণনা দিয়েছেন -

> কবে যে প্রথম লিখতে শুরু করি তার সন তারিখ কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাল্য রচনার সেই বিষয় বস্তুও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। মনে পড়ে ঠাকুরদার সেই আয় কাঠের বাক্সের মধ্যে একখানি পৌরানিক নাটক পেয়েছিলাম 'গয়াসুরের হরি-পাদপদ্মলাভ।' সেই বইয়ের গোড়ার দিকটাও ছিলনা শেষের দিকটাও ছিল না। তবু সেই নাটকের অনুকরণে আমিও একটি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আর একবার আমাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখেছিলাম ডায়রির মত করে। তখন আমি ভাঙ্গা হাইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি।[৫]

এর পর নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও কিছু সহপাঠী মিলে আহ্বান পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তিনি নবম শ্রেণীতে পড়েন। এছাড়া একই সময়ে তার ভাইদের সঙ্গে আর একটি হাতে লেখা পত্রিকা করেন, এটির নাম ছিল 'মুকুল'।

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি হাতে লেখা আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন সেটি মাসিক পত্রিকা 'জয়যাত্রা'। কলেজে অন্যান্য বন্ধুদের যথা সত্যেন্দ্রনাথ রায়,

অচ্যুত গোস্বামী ইত্যাদিদের সঙ্গে 'অভিসার' নামে হাতে লেখা পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত লেখা হল 'মূক' নামে একটি কবিতা, যেটা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। এই একই সময় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন'। সেই গল্পটি পড়ে 'দেশ'এর দপ্তর থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাকে আরো গল্প পাঠানোর জন্য চিঠি লিখেছিলেন। লেখকের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।'[৬] এরপর ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে তাঁর প্রায় ২২।২৩টির মতো গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭-এর মধ্যে দেশে তাঁর চার পাঁচটির মতো গল্প প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' 'বঙ্গশ্রী' 'পরিচয়' আনন্দবাজার পত্রিকায় দোল, পূজা ও রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার জগৎ থেকে তিনি ক্রমশ সরে আসতে থাকেন, তবে কবিতার সম্পর্কে তার গভীর ভালবাসা ছিল, তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন -

> যারা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন তারাই জানেন
> কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ'। এই বইখানি বেরোয় ১৯৪৭ সনে। তার চার বছর আগে ১৯৪২ কি ৪৩-এ বইখানি 'হরিবংশ' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। তখন সাগরময় ঘোষ 'দেশে'র সহকারী সম্পাদক। তিনিই চেয়েছিলেন সেই ধারাবাহিক উপন্যাস।[৭] 'দেশে' যখন 'হরিবংশ' বেরোয় তখন নরেন্দ্রনাথ এবং কালিকলমের সম্পাদক মুরলীধর নিবেদিতা লেনের একটি বাড়িতে তিন-তলার একই ঘরে বসবাস করতেন। লেখক আত্মকথায় বলেছেন -

> বোমাবর্ষনের ভয়ে আমার সেই আত্মীয় গৃহের গৃহিনীরা পুত্রকন্যা নিয়ে স্থানান্তরিতা। পাশাপাশি তক্তপোষে মুরলী বাবু থাকেন, আমি থাকি আরো অনেকে থাকেন। [৮]

'হরিবংশ' লেখাটি যখন বের হয় তার কিছুকাল আগে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয় 'প্রত্যহ' পত্রিকার অফিসে। তিনি লেখকের 'হরিবংশ' সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। 'হরিবংশ' রূপান্তরিত নামান্তরিত হয়ে 'দ্বীপপুঞ্জ' নামে বের হলে বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন সেই উৎসাহদাতা সন্তোষকুমার ঘোষকে। 'দ্বীপপুঞ্জ'র প্রকাশক হতে চেয়েছিলেন দুজন, তাদের অন্যতম নাট্যকার দিগিন্দ্রনাথ। লেখক বলেছেন -

> বইখানি যখন বেরোয় আমি সানুজ পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ব্রজদুলাল স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়ির একতলার বাইরের একখানি ঘরে থাকি, বেশি বৃষ্টি হলে সেখানে জল ওঠে। তক্তপোষের ওপর বসে বসে আমি দ্বীপপুঞ্জের প্রুফ দেখি। নিজেই যেন দ্বীপবাসী। আর বৃষ্টি ভিজে ছাতায়ুড়ি দিয়ে ধীরেন রায় নিতে আসেন সেই প্রুফ। দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে। সেদিনের বর্ষাকে ঠিক দুঃখের বর্ষা বলে মনে হতনা। বরং দিনগুলি আশা ভরসায় ভরা ছিল আমি তখন প্রথম ঔপন্যাসিক হতে যাচ্ছি। [৯]

নরেন্দ্রনাথের রচনাকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যায় - ছোটগল্প, উপন্যাস এবং ছোট উপন্যাসের মতো বড় গল্প যাকে বলা যায় নভেলেট। নরেন্দ্রনাথের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে। বিশেষতঃ প্রথম পর্বের ছোট গল্পগুলিতে। 'শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, গঠন বা ফর্মেও এরা অনবদ্য।' [১০]

নরেন্দ্রনাথ বিবাহিত জীবন শুরু করেন ১৯৩৮ সালে। কিছুটা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পিতার আদেশ এবং একান্ত আগ্রহের জন্য সদরদির নিকটবর্তী চোয়ড়দি গ্রামের অবিনাশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সঙ্গীতে পারদর্শিনী, চতুর্দশী শোভনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তখনও তিনি বি.এ. পাশ করেননি। ১৯৩৯-এ অনুজ ধীরেন্দ্রনাথ আই.এ পাশ করলে তাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসেন। মূলতঃ ছাত্র পড়ানোই ছিল নরেন্দ্রনাথের অর্থ উপার্জনের উপায়, তবে গল্প লিখেও কিছু উপার্জন হতো। যদিও দু-আনায় একজনের একবেলা খাওয়া হয়ে যেত। তবু লেখক তাঁর ভাইকে নিয়ে হিসেব করে চলতেন। এই একই বছরে তিনি জীবনে প্রথম চাকরী গ্রহন করেন অর্ডনান্স ফ্যাক্টরীতে। চাকুরীর স্থান হল দমদমে, এবং সময়টি হল যুদ্ধের সময়। সৈন্যদের সরবরাহে জিনিষ গণনা এবং হিসেব রাখা তাঁর কাজ ছিল, কাজটি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দের ছিলনা, কিন্তু এখান থেকেই তিনি কিছু গল্পের প্লট পেয়েছিলেন, যেমন 'নেতা' (১৩৫১ :ভাদ্র) গল্পটি। এই গল্পে তাঁর চাকুরীস্থলের আফিসের পরিবেশটিকে পটভূমি রূপে ব্যবহার করেছেন।

১৯৪২-এ যুদ্ধ যখন চলছে তখন নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। স্বাভাবিক-ভাবে সংসারের প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং নরেন্দ্রনাথকেই জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। ১৯৪৩-এ যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের মধ্যে স্ত্রী, দুই শিশুপুত্র এবং ভাই ধীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এই সময় তিনি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত। 'প্রত্যহ' নামে একটি সাময়িক পত্রিকার অফিসে সন্ধ্যার সময় তিনি পার্ট টাইম কাজ নিয়েছিলেন এরপর তাঁকে ব্যাংক থেকে জব্বলপুর শাখায় বদলি করা হয়, অনেক অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও তিনি শুধু বাইরের দেশ দেখার আগ্রহে রাজি হয়ে যান। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি পুনরায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ে তিনি পরিবার সহ বাস করতেন ১৭।১, ব্রজদুলাল স্ট্রীটে। এই সময় তিনি ব্যাঙ্কে চাকুরীরত অবস্থায় একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং সাসপেণ্ড হন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ও সজনীকান্ত লেখককে এই মামলায় নানাভাবে সাহায্য করেন। পরে লেখক এই চাকরীতে ইস্তফা দেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ হলে গ্রাম থেকে সবাইকে নিয়ে ১১১ বি নারকেল ডাঙ্গা মেইনরোডে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে লাগলেন। 'সোনার তরী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এই সময় প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস 'অমরে অমরে'। তাঁর বিখ্যাত 'রস' গল্প এই সময় লেখা। নরেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মূল্যবোধের নানা পরিবর্তন নিম্নবিত্ত বাঙালীর জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ আর চল্লিশের দশকের আরম্ভ, এই সময়টি বাঙালি মধ্যবিত্ত - নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে এ বড় সংকটের কাল।[২১] এই সময় থেকেই নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কোন অসাধারণ, অভিনবত্বের দিকে তিনি যেতে চাননি, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের অত্যন্ত পরিচিত জগৎকে পাঠকের কাছে অপূর্ব কৌশলে নিয়ে এসেছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'গল্প লেখার গল্প' নামে এক বেতার কথিকায় (বৈশাখ ১৩৮২) প্রসঙ্গক্রমে লেখেন -

> পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে

পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।[১২]

যে কোন লেখকের রচনা বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার পরিবেশ ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে। নরেন্দ্রনাথের স্বভাবের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন অন্যমনস্ক একটি মানুষ। খুব সহজে মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। তিনি ছিলেন স্বল্পবাক্ লাজুক স্বভাবের মানুষ। তার প্রমান - বাদকুল্লার অনুষ্ঠানের বক্তৃতার আসরে রণজিৎ সেনকে অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেছেন -

আমার বলাটলা কিছু আসে না, বলতে গেলে ভালও লাগবে না কারুর, যা বলবার আপনিই বলুন, আমাকে সেভ করে দিন।[১৩]

তিনি অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই গ্রামে মেয়েদের জন্য স্কুল হয়েছিল। এছাড়া বাড়িতে একটি উন্নত মানের লাইব্রেরী নিজে গড়ে ছিলেন। তখনকার অনেক মাসিক পত্রিকা এই লাইব্রেরীতে আসত। তিনি নানা দিক থেকে নারী প্রগতিবাদে বিশেষ ভাবে তৎপর ছিলেন। মূক স্বভাবের নরেন্দ্রনাথের এই সব বিষয়ে মুখরতার শেষ ছিল না। ঘর সংসারের কাজে পুরোপুরিই অপটু ছিলেন। কথার চাইতে সারাক্ষণ আবৃত্তি করতেন। সখ সৌখিনতার মধ্যে তার ফোনে কথা বলা, পত্র লেখা, 'ফুল কেনা প্রায় নেশার মতো ছিল।'[১৪] বাইরের জীবনে নরেন্দ্রনাথ এলোমেলো স্বভাবের মানুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের চিন্তাধারায় ছিলেন সাজানো গোছানো বলিষ্ঠ লেখক। মেয়েদের পরাধীনতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিজের স্ত্রীর(শোভনা) শিক্ষা এবং সঙ্গীত চর্চার দিকে তার বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল। তার স্ত্রী শোভনা মিত্র স্মৃতি চারণায় বলেছেন - গানের আওয়াজে লেখার অসুবিধে হতে পারে তা ভেবে আমি দরজা ভেজিয়ে দিতাম। তা দেখে সুন্দর মৃদু হেসে বলতেন 'দরজা বন্ধ করোনা',

গানের সুর শুনে আমার বরং লিখতে ভালো লাগে। আমার লেখার অসুবিধে হবে না।'[১৫] তার অনেক ছোট গল্পেই সঙ্গীত শিল্পীর জীবনের টানাপোড়েনের চিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথের গৃহে প্রিয় পরিচিতজনের আসা যাওয়া সর্বদা ছিল, কিন্তু এই ভিড় আর কোলাহলের মধ্যে গভীর মনোযোগে লিখতেন। 'লেখার পাত্রপাত্রীদের শোক দুঃখ উচ্ছ্বাস, আনন্দের সব ভাবনার ছায়া লেখকের মুখের অবয়বে ফুটে উঠত।' সে রকম কোন মুহূর্তে লেখক নিজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, আবার কখনো হাসির উচ্ছ্বাসও দেখা যেত। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা অন্তরের থেকেই করতেন, তার বিখ্যাত একটি গল্পে লিখেছেন -

> শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ককে আমি বড় বলে মানিনে, নিত্যদিনের মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা আমার কাছে অনেক বড়।

কথাসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক সমরেশ বসু তার পূর্বসূরী নরেন্দ্রনাথের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন -

> প্রথম দর্শনে ছোটখাটো স্বল্পবাক্ মানুষটির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়েনি। এমনকি মনে হয়েছিল ব্যক্তিত্বহীন। ... কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছিল বই কি ? তা ছিল তাঁর ভাষা আর আচরণের মধ্যেই। তাঁর নির্বাক কিন্তু ভাষাময় দৃষ্টি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে বলা ছোটোখাটো উজ্জ্বল কয়েকটি কথা ও জিজ্ঞাসা আচরণে চঞ্চলতাহীন স্নিগ্ধতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর বৈশিষ্ট্য। ... এক লহমায় দেখে আর বুঝে নেবার মতো ঝংকার তার ছিল না। ছিল না তার কারণ সম্ভবত অহংবোধের কণামাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না।[১৬]

বড় পত্রিকার যখন তিনি নিয়মিত লেখক তখনও ছোট পত্রিকায় সম্পাদকের সঙ্গে ছিল তাঁর

একই রকম ব্যবহার। চাওয়ার আগেই তাদের 'অবাক করে দিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন কবে চাই ?'[১৭] শৌরকিশোর ঘোষ বলেছেন যে তিনি বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন, নিজে বেশী কথা না বললেও বন্ধুদের সমাবেশ উপভোগ করতেন।[১৮] যে সময়ে নরেন্দ্রনাথ লিখছিলেন তখন যুদ্ধ, রাজনীতি আমাদের সমাজের ওপর, জীবনের ওপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত হলেও ভেসে যান নি। তিনি এই সময়কে নিঃশব্দে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যুদ্ধ সমস্যা নিয়ে লেখা গল্পগুলো আমাদের মনকে ঘা দেয়, আন্দোলিত করে। অন্তরে তিনি দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। 'নরেন্দ্রনাথ - সাহিত্যকে যে হুজুগে পরিণত' করেননি অজস্র প্রলোভনের মধ্যেও সুধর্মে নিধনকেই যে শ্রেয় মনে করেছিলেন, এই কারণেই তিনি আমাদের নমস্য।'[১৯]

নরেন্দ্রনাথের মধ্যে মধ্যবিত্ত যে মানসিকতা এবং রক্ষণশীলতা ছিল, তিনি তাঁর নিজস্বতা থেকে কখনোই সরে আসেন নি '-'তার লেখা পড়লেই জানা যায় বিদ্বেষ কি তিনি তা জানেন। রক্তঝরা কামনা কেমন তাও তার অজানা নয়। কিন্তু তার অন্বেষণ সমস্ত ভাঙাচোরা মুখের ভেতর থেকে একটি প্রসন্ন মুখ আবিষ্কার করা।'[২০]

গ. পূর্ববর্তীদের প্রভাব

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আগে ছোটগল্পের জগতে যারা নতুনত্বের স্বাদ এনেছে বা চমক এনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদিরা, এবং এদের অনেকটা আগে গ্রাম বাংলার সমস্যা নগরমুখী জীবনযাত্রা নিয়ে যিনি বাংলা সাহিত্যকে অনেকখানি অলংকৃত করেছেন তিনি

হলেন শরৎচন্দ্র। এছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীরা তাদের প্রেম, প্রীতি স্নেহের এবং নির্যাতিতার রূপ নিয়ে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের লেখার এই বিষয়গুলোতেই বেশ মিল লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে দেখা যায় গ্রাম থেকে শহরে মানুষ উপার্জনের, শিক্ষার প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের আকর্ষণকে ভুলতে পারছে না, নরেন্দ্রনাথের রচনায় গ্রাম এবং শহরে উভয়ই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ জীবনের একটা বৃহৎ সময় কাটিয়েছেন পূর্ব-বাঙলায়। তাই গ্রাম বাংলা তার গল্পে বারংবার এসেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে চিরকালের জন্য চলে আসাতে একটা দুঃখ তার মধ্যে সর্বদাই ছিল।

শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক ছিলেন। বাঙালী পরিবারের একেবারে আঁতের কথাকে তিনি গভীর মমতায় এঁকেছেন। বিশেষ করে নারীদের যে স্নেহশীলা, মমতাময়ী রূপ, এবং ভাবাবেগ, তাকে তিনি উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। নরেন্দ্রনাথ ও একটি বিশেষ সময়ে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের প্রতি-নিধিস্থানীয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর গল্পে স্ত্রীচরিত্রগুলিতে সহনশীলতা, আত্মত্যাগের ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, এ ক্ষেত্রেও তিনি শরৎচন্দ্রের অনুসারী বলা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারীদের তুলনায় 'প্রেমের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের নারীরা অনেক বেশী উদ্যোগী ও সাহসিক-উন্নত চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।'[২১] শরৎচন্দ্রের পর সময়ের পরিবর্তনের ফলে নারীদের মধ্যে ক্রমশ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মৌলিক একটা মিল থেকে গেছে, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের নায়িকারা এ যুগে থাকলে হয়তো এই প্রগতিশীলতায় চলে আসতো।

আধুনিক কথা সাহিত্যের লেখকদের লেখায় পল্লীগ্রাম ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের লেখায় পল্লী, প্রধান

উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পল্লী তাদের কাছে প্রধান বাস্তব রূপে দেখা দিয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো লেখকেরা ছিলেন গ্রামের সন্তান। শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রথম পল্লীসমাজের ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ উপস্থাপনা ঘটেছে। তার রচনায় যে সমাজ রয়েছে তা বর্ণবাদ শাসিত। উঁচু বর্ণের সমাজপতিরা সেখানে সামাজিক দলাদলি ও কুৎসা রচনায় দক্ষ। কিন্তু সেখানে মহৎপ্রাণ মানবিক মানুষও রয়েছে, সমাজ যাদের ভিন্ন ভাবে পীড়ন করে। শরৎচন্দ্রের পর পল্লীসমাজের বাস্তবতার রূপকার রূপে এনেছেন জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রমুখ। পল্লী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা ছিল - সেখানকার জীবন হল সবুজ, শান্ত সুন্দর। সরল মানুষেরা নিশ্চিন্ত জীবন কাটায় সেখানে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পল্লী সম্পর্কে এই প্রথাগত ধারণাকে দূরে সরিয়ে পল্লীর কঠিন বাস্তব রূপকে তার সাহিত্যে নিয়ে এলেন। 'তাঁর পল্লীর অধিকাংশ মানুষই ইতর, লোলুপ, বিবেকহীন, দুশ্চরিত্র ও আত্মসর্বস্ব। ভালোরা সেখানে মন্দদের কাছে পরাজিত হয়। তাদের জীবন ভরে যায় অশেষ দুর্গতিতে।'[২২]

নরেন্দ্রনাথের গল্পে পল্লীর চিত্র আমরা জগদীশ গুপ্তের মতো পাই না। জগদীশ গুপ্তের মানুষদের নরেন্দ্রনাথের গল্পে আমরা দেখিনা। জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মানুষের জীবনের ব্যর্থতা কঠিন চিত্রের রূপকার। মানুষের ব্যর্থতার পিছনে এক রহস্যময় অশুভ শক্তিতে তার বিশ্বাস ছিল। তার গল্পে মানুষ জটিল, প্রকৃতি নিষ্ঠুর, নিয়তিও সেখানে কুচক্রী। মানব চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলিকে তিনি তার 'পয়োমুখম্' 'গতিহারা জাহ্নবী', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' ইত্যাদি গল্পে নিয়ে এলেন যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার এই পূর্ববর্তী লেখকের কোন বৈশিষ্ট্যকেই গ্রহণ করেননি, বা তাকে জগদীশ গুপ্তের রচনা প্রভাবিত করতে পারেনি।

নরেন্দ্রনাথ স্বভাবের দিক দিয়ে ছিলেন অনেকখানি বিভূতিভূষণের সমগোত্রীয়। অনেক লেখকেরই চলতে চলতে পেছনে ফিরে তাকানোর বাসনা থাকে, ফেলে আসা জীবন, মানুষ তাদের বারবারই ইশারায় ডাকে। তাই এদের রচনার প্রকৃতিও কিছুটা মন্থর বা বলা যায় যেন স্মৃতি বেদনায় আর্দ্র। বিভূতিভূষণ এই গোত্রের লেখক। নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ফেলে আসা জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং বেদনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের একটা মন দুঃসাহসী, রোমান্টিক। আর একটি মন একান্তভাবে অতীত লগ্ন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মন সবটাই ঘরোয়া, কিন্তু সে মন গ্রামীন বা অতীত লগ্ন নয়। বিভূতিভূষণ নগর জীবনকে কখনোই আপন করে নিতে পারেননি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে পরিপূর্ণভাবে নাগরিক হয়ে না উঠতে পারলেও নগর জীবনে তার অনাগ্রহ ছিল না।

আবার তারাশঙ্করের রচনায় যে পল্লীর চিত্র পাই - তা নরেন্দ্রনাথের রচনায় দেখা যায় না। তারাশঙ্করের পল্লী লালমাটির রূঢ়তায় ঘেরা, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পল্লী অনেক আর্দ্র। তারাশঙ্করের মানুষেরা অন্তজ: শ্রেণীর, সেখানে নরেন্দ্রনাথের মানুষেরা সম্পূর্ণ রূপে বাঙালী। একজন রাঢ় বাংলার কথাকার, অন্য জন জলে জলে একাকার আর্দ্র পূর্ববঙ্গের মানুষ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নগরে যে রহস্যবোধ, নাগরিক জীবনের জটিলতা, বিস্ময় রয়েছে তা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই, আবার নগর জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বৈজ্ঞানিক সুলভ কৌতূহল বা 'নির্মোহ বিশ্লেষণ তা-ও হয়তো নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই। তাহলেও নগর জীবনের রূপায়নে নরেন্দ্রনাথ যে প্রেমেন্দ্র-মাণিকের উত্তর সাধক তাতে সন্দেহ নেই।'[২৩]

এই সময়কার লেখকদের মধ্যে যুদ্ধ মন্বন্তর, বস্ত্রসংকট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখার একটা প্রচেষ্টা চলছিল। প্রায় একই বিষয় বস্ত্রসংকট নিয়ে লেখা নরেন্দ্রনাথ

এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে বেশ তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্রনাথ একটি গল্পে লিখেছেন -

> সেলাই করা সুবিধা হচ্ছেনা দেখে গায়ের রাগে চাঁপা নিজেই বোধহয় সেগুলি আবার টেনে ছিঁড়েছে। পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারীদেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল।[২৪]

এরকম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

> ... কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট পাথর ভরে জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।[২৫]

দুটো গল্পেই বস্ত্রের চরম সংকটের দিনগুলির কথা রয়েছে। কিন্তু মাণিকের গল্পে যে তীব্র জ্বালা সেটা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই। অসহায় অবস্থায় মৃত্যু যে কত ভয়ংকর, মাণিক তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে যান কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মানুষের অসহায়তাকে বুঝিয়ে দেন অনেকটা আভাসে ইঙ্গিতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ঘণের মুলুক' অথবা সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' 'পরশুরামের কুঠার' ইত্যাদির মতো অল্পবিস্তর চমকপ্রদ বৈচিত্র্যের স্বাদ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে আমরা পাই না। তাঁর গল্পের পটভূমি মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনের পারিবারিক ক্ষেত্র।

ঘ. নরেন্দ্রনাথের গল্প ও রচনাবৈশিষ্ট্য

আদিপর্ব (১৩৪৬-৫০)

নরেন্দ্রনাথ একসময় তাঁর রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন -

> ... প্রীতি, প্রেম, সৌহার্দ্য স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মোটামুটি ভাবে ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০-এ লেখা গল্পগুলিতে এই মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক এবং মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। ১৩৪৬-এ 'পুরুষ' এবং ১৩৪৯-এ 'যৌথ' এই দুটি গল্পে দেখা যায় পরিবারের একজন বধূকে নিয়ে দু-ভাইয়ের মধ্যে ঈর্ষার সংস্কার। অবশ্য প্রথম গল্পে (পুরুষ) এই ঈর্ষার মধ্যে দিয়ে যোগেনের মনে এক-ধরনের জেদ সৃষ্টি হয় আর তাই সে তার পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় 'স্ত্রী অনিমা' কে শাসন করে। গল্পে দেখা যায় যোগেনের ভাই যুগেন - দুটিতে বাড়িতে এলে অনিমা খুশীতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে যা যোগেন সহ্য করতে পারে না এবং যুগেনের সঙ্গে অনিমাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে, অনিমা সে কথা গ্রাহ্য করে না, এর ফলে যোগেন তার স্বামীত্ব এবং পুরুষত্ব দেখাতে শক্তি প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয় গল্প 'যৌথ'তে দুই ভাই-এর মধ্যে যোগসূত্রকারী বাড়ির একমাত্র স্ত্রী মল্লিকাকে নিয়ে রেষারেষি। অনুরূপের স্ত্রী মল্লিকা সে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামী এবং দেওয়র স্বরূপকে নিয়েই অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে চলে। স্বরূপ হঠাৎ দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায় এবং শিল্পকর্মে নিপুন হয়ে ওঠে। মল্লিকা দুই ভাইকেই

খুশী রাখতে চেষ্টা করে, ফলে তার স্বামী তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, ছোটভাই সুরূপের সঙ্গে তার নিজের স্ত্রী মল্লিকার সম্পর্ক সে ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেনা। মানুষে মানুষে বিচিত্র সেই সম্পর্কের ইঙ্গিত এই গল্প দুটিতে নরেন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন। ১৯৪১-এ লেখা তাঁর অন্য দুটি গল্প 'কুমার সম্ভব' এবং 'কুমারী শুক্লা' প্রথম গল্পটিতে রয়েছে সমাজে অবহেলিত এক কু-দর্শনা নারীর কথা, যে সন্তানের জন্ম দিয়ে 'মা' ডাক শুনতে চায় কিন্তু নিজের কু-রূপে যদি সন্তান তাকে ঘৃণা করে এই আশঙ্কায় ভাবী সন্তানের চোখ দুটিকে অন্ধ করে দিতে চায়। এক ধরণের বঞ্চনার থেকেই তার মধ্যে যে দুঃখের বা মন-বেদনার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে জন্ম নিয়েছে এ ধরণের নিষ্ঠুর ভাবনার। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার আড়ালে রয়ে গেছে অশ্রু সজল এক মমতাময়ী মায়ের মন। কিন্তু দ্বিতীয় গল্প 'কুমারী শুক্লা'তে দেখা যাচ্ছে - মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত পাত্রকে না গ্রহণ করার প্রসঙ্গ আসছে, অর্থাৎ সমাজের যে একটা পরিবর্তন সেটা আমরা নরেন্দ্রনাথের এই গল্পে দেখতে পাচ্ছি। তবে বাঙালী মধ্যবিত্তমন নারীর এই নিজস্ব পছন্দ করার বিষয়কে সহজে মেনে নিতে পারেনি। শুক্লার সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনায় প্রশান্ত'র বিচ্ছেদ হয়ে গেলে শুক্লার বাবা তাই বলেন -

> দূর হয়ে যা হারামজাদী লেখাপড়া শিখেছিস বলেই কি
> স্বেচ্ছাচারিনী হতে হবে ?'

শুধু সুনির্বাচিত পাত্রকে গ্রহণ করার সাহস-ই নয়, বয়সে ছোট এরকম পুরুষকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গও লেখক এনেছেন। সমাজের পরিবর্তন এভাবেই আমরা এখানে পেয়ে যাই -

> বয়সে দু-বছরের বড়, কিন্তু জাতে দু-ধাপ ছোট,
> কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দিনক্ষণ সারা পঞ্জিকায়
> কোথাও পাবে না।[২৬]

১৩৫০ - এ গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'মহাশ্বেতা', 'হলদেবাড়ি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'মদনভস্ম'। নরেন্দ্রনাথের মূল পরিচয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্পকার হিসেবে। তাঁর অনেক গল্পের মূল শীর্ষ মুহূর্তটির অবলম্বন হয় মানুষের মনের কোন না কোন গ্রন্থি উন্মোচন, সে কারণেই তাঁর গল্পের একটা বড় অংশ ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'মহাশ্বেতা' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে ভালোবাসা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এসেছে। 'মহাশ্বেতা' গল্পে চিন্মোহন প্রকৃতপক্ষে ভালোবেসেছিল অমিতার শ্বেতবেশের শুভ্র রূপটিকে, বিবাহের পর যখন সালংকারা অমিতাকে সে দেখে তখন মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, কারণ এ রূপের সঙ্গে সে পরিচিত নয়, এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধও নয়। এখানে বোঝা যায় বিবাহ বন্ধনে পরস্পর তারা আবদ্ধ হলেও ভালোবাসায় তাদের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে গেল। 'হলদেবাড়ি' গল্পেও লেখক প্রেমের প্রসঙ্গ এনেছেন, কিন্তু এ গল্পে যুদ্ধের সময় এবং খাদ্যাভাবের প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে এসেছে। এ গল্পে প্রেম মূল বিষয় হলেও যুদ্ধের সৈন্যদের পদধ্বনি গল্পের প্রথম থেকেই শোনা যায়, এ গল্পেই দেখা যায় একজন অনাহারে পীড়িত মানুষ, যে ডাস্টবিন থেকে খাবার সংগ্রহে সচেষ্ট হচ্ছে। ১৩৫০ -এ বাংলার বুকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার চিত্র কোন রকম অতিরঞ্জিত না করে লেখক দু-একটি কালির আচড়ে অসাধারণ ভাবে এ গল্পে এঁকেছেন। এই দৃশ্য আমাদের পঞ্চাশের দশকে সোমনাথ হোড়ের ভাস্কর্য অথবা 'জয়নুল আবেদিনের আঁকা কলকাতার ফুটপাতে খেতে না পাওয়া ছিন্নমূল মানুষের'[২৭] কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই ১৩৫০-এর অন্যতম গল্প হল 'মদনভস্ম'। এই গল্পেও নরেন্দ্রনাথ ভালোবাসা, ঈর্ষা - এই প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করলেও গল্পের শেষে এসেছে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের চিত্র, জঠরের অনলে যেখানে ভালোবাসা, কামনাও দগ্ধ হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে একমুঠো ভাতকে কেন্দ্র করে, ভালোবাসায় গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলি ছিন্ন হয়ে যায় নিরন্ন খাদ্যের চাহিদায়।

দ্বিতীয় পর্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫১ থেকে ১৩৬০-এর মধ্যে যে গল্পগুলি লিখেছেন, প্রথম পর্বের গল্পগুলি থেকে সেগুলি একেবারেই ভিন্নস্বাদের। দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে যে পট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সেটা এই পর্বের কিছু কিছু গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'নেতা', 'চোর', 'আঘাত', 'পুনরুক্তি', সত্যাসত্য, আবরণ, 'সেতার' ইত্যাদি। আবার মুসলমান সম্প্রদায়কে ঘিরে গল্পগুলি রয়েছে এ পর্বেই, যেমন পুনশ্চ, চাঁদমিঞা, দ্বিরাগমন (কুসুম)। তাঁর বিখ্যাত 'রস' গল্পটি এই পর্বেই রচিত হয়েছে (১৩৫৪)। এছাড়া রয়েছে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের কথা, অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

—

১৩৫১র ভাদ্রে প্রকাশিত হয় 'নেতা' গল্পটি। এ গল্পে রয়েছে ঘটনাচক্রে কথক ভট্টাচার্য নেতা হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাহেবের অকথ্য গালাগালের প্রতিবাদ জানালে এই ভট্টাচার্যকে বরখাস্ত করা হয় কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে তাকে সাহেবের শর্তে রাজি হতে হয়। অর্থাৎ নিজস্ব যে মূল্যবোধ তাকে বিসর্জন দিতে হয়। আবার সেই বছরের আঘের গল্প হল 'চোর'। এই গল্পে অমূল্য কিছুটা দারিদ্র্যের কারণে কিছুটা স্বভাবের দোষে ছোটখাট চুরি করে কিন্তু তার স্ত্রী যেদিন সত্যিই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুরি করে সেদিন অমূল্য আচমকা আঘাত পায়। সে তার স্ত্রীকে চুরির জন্য প্ররোচনা দিলেও মনেপ্রাণে কখনোই সে চুরি করুক - এটা অমূল্য চায়নি। নিম্নবিত্ত মানুষ অর্থনৈতিক চাপে কীভাবে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করছে, মূল্যবোধ বিসর্জন দিচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে। 'পুনশ্চ' গল্পেও (১৩৫২) রয়েছে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। যুদ্ধের ফলে যখন খাদ্য জোটে না তখন জৈনুদ্দিনের ফতেমার প্রতি ভালোবাসায় ঘাটতি

পড়ে। যে ফতেমাকে বিয়ে করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাকেই অতি সহজে সে তালাক দেয়। যুদ্ধের ফলে কেমন করে অনাহারে বাংলার গৃহগুলি শূন্য হয়ে গেছে, মানুষ কিভাবে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য আত্মিক মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে তা দেখা যায়। দেহজীবিনী ফতেমার সঙ্গে তারই এক সময়কার স্বামী জৈনুদ্দিন যখন দরাদরি করে তখন বোঝা যায় মানুষের শুভবোধ কীভাবে ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়েছে। মানুষ পরিস্থিতির কাছে কতখানি অসহায়।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে থাকাকালীন সময়ে যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধ চালাবার খরচ সংগ্রহ করেছিল তাদের অধীন উপনিবেশগুলিকে শোষন করে। এর ফলে মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ বারংবার আঘাত করেছিল এই সব দেশের অর্থনীতিকে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের খাদ্য সংকটের পাশাপাশি ভয়াবহ বস্ত্রসংকট দেখা দিল। কাপড়ের অভাবে তখন দরিদ্র ঘরের মেয়েরা দিবালোকে বের হতো না, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের জন্য অনেক রমণীই দেহ-জীবিনী হয়েছিল। কাপড়ের জন্য লুটতরাজও চলতো। এই সংকট বাংলা ছোটগল্পে রূপায়িত হয়েছে ব্যাপকভাবে যা দেখতে পাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুবোধ ঘোষের গল্প পর্যন্ত। নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ'(১৩৫২) গল্পেও রয়েছে এই সংকটের কথা। চাঁপাকে তার স্বামী বংশী কাপড় দিতে পারে না। বংশী পতিতাপল্লীতে গিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে নারীকে দেখে না, দেখে তার পরনের কাপড়টিকে। সুখদার দেহ থেকে কাপড় খুলে নিয়ে যাবার সময় নগ্ন সুখদাকে দেখে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়, তাই - 'হঠাৎ দুচোখ বুজে সেই কমলা রঙের শাড়ীখানা ছুড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহটার ওপরে।'[২৮] লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন অভাবের কাছে মানুষের শুভবুদ্ধি হার মানে নি। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য লেখকদের এখানেই পার্থক্য। তিনি কখনোই নির্মম নিষ্ঠুর হননি। যেমন অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের 'বস্ত্র' গল্পে দেখা যায় ছাদেম একটা আস্ত বস্ত্র পায় এবং সে ব্যবহার করে সেটাকে ঠিকই কিন্তু পরনের জন্য নয়, গলায় দড়ি দেবার জন্য, সেই কাপড়ই দ্বিখন্ডিত হয়ে আবার ফিরে আসে তার স্ত্রী এবং পুত্রবধূর পরণে। 'সেই কাপড়ে সসম্মানে তিন অংশ বোধহয় হতে পারতনা। আর আগেই শাশুড়িতে বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে।'[২৯] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতি আরো নিষ্ঠুর ভাবে এঁকেছেন 'দুঃশাসনীয়' গল্পে, 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবেনা বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতগুলি ইট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁকে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।' আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে কাপড়ের আড়তদার শুষিকদের হেঁসোগুলো দেখে ভাবে - 'যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন।'[৩০] কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরণের প্রতিবাদী সংলাপ দেখা যায় না, কারণ সমাজ পরিস্থিতি ও মানবমনের সম্পর্ক নির্ণয়ের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। সমাজে সংস্কারের কথা প্রকট ভাবে কখনোই তাঁর গল্পে স্থান পায়নি। তাই অন্ন সমস্যা বা বস্ত্রসমস্যাকে একমাত্র অবলম্বন করে তার কোন গল্পেই দেখা হয়নি। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি রূপে এ সব ঘটনা তার গল্পে যথেষ্ট পরিমানে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে নরেন্দ্রনাথের গল্প প্রায় নেই বললেই চলে। একটি মাত্র গল্প 'পতাকা'(১৩৫৩)য় এই সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। বাল্যে এবং কৈশোরে পূর্ববাংলার গ্রামে দরিদ্র মুসলমান সমাজকে তিনি দেখেছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনেক আগেই। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ছোটবয়স থেকেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাই তাদেরকে 'মুসলমান' হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিতে কখনোই দেখেননি। দেশবিভাগের পর হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা যখন অত্যাচার করলো, তখন তাঁর লেখায় তিনি সেই ক্রোধ বা ঘৃণাকে স্থান

দিতে পারলেন না। সাম্প্রদায়িকতার প্রতি লেখকের কোনদিনই সমর্থন ছিল না। পূর্ব সম্পর্কের ভালোবাসার বন্ধন-ই শিল্পীর মনে এনেছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা।

যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পথে নামতে হয়েছে। যদিও মধ্যবিত্ত পুরুষ সমাজ খুব সহজে এটাকে মেনে নেয়নি। নরেন্দ্রনাথের 'সেতার' গল্পে দেখা (১৩৫২) যায় যক্ষায় অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা এবং সংসার খরচ জোগাবার জন্যই নিলীমা গানের টিউশনি নেয়। কিন্তু সত্যিই নীলিমা যেদিন পেশাগত ভাবে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেল সেদিনই স্বামীর চাহিদাকে তার অধিক মূল্য দিতে হল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন এমন একটি সময়ের লেখক যে সময় মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্থান দখল করেছে। কিন্তু তখনও শিক্ষিতা মেয়েদের ওপর তাদের পরিবারের অভিভাবকদের কর্তৃত্ব প্রবলভাবেই ছিল। মেয়ে কাকে বিয়ে করবে, চাকরী গ্রহণ করবে কিনা এ সব বিষয় অভিভাবকদের মতানুসারেই হত। কিন্তু ক্রমশ সেই শাসনের বন্ধন থেকে স্বাধীন ভাবে তারা চলতে চাইল। এর ফলে পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে এই সময় একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নারী প্রজন্ম তৈরী হতে লাগল যারা পরিবারের ইচ্ছা অনিচ্ছার থেকেও নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলো। সমাজের মধ্যে এই যে একটা পট পরিবর্তন সেটা নরেন্দ্রনাথের 'অবতরনিকা'(১৩৫৬)'বিলম্বিতলয়'(১৩৫১) ইত্যাদি গল্পে দেখা যায়। 'অবতরনিকা'তে রয়েছে পুরোপুরি অর্থনৈতিক সূত্রের দ্বারা সংসারের রূপ পরিবর্তিত হবার কথা। স্বামীর 'সংসার চালাবার জন্যই আরতির অর্থ উপার্জন করতে নাযা। এই স্বামীই তাকে অফিস থেকে দেরিতে আসার কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে চাকরী ছাড়তে বলে। আবার সহকর্মিনীর প্রতি

অন্যায়ের প্রতিবাদে আরতি যখন নিজেই চাকরী ছেড়ে দেয় তখন এই পরিবারের লোকেরাই আবার ক্রুদ্ধ হয় কারণ পরিবারে সংসার খরচ চালাবার মতো আর কোন উপায় নেই। এই গল্পেও দেখা যায় নারীর অর্থ উপার্জনকেও পুরুষ নিয়ন্ত্রন করতে চাচ্ছে।

১৩৫২-৫৪তে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প প্রেমকে উপজীব্য করে লিখেছেন। তার মধ্যে 'পুনশ্চ চাঁদমিঞা', 'রস' ইত্যাদি গল্পগুলি মুসলমান সমাজ নির্ভর। 'চাঁদমিঞা', তে প্রেমের যে রূপ রয়েছে 'দিবারাগম' অতিক্রম করে 'রস' গল্পে তা অনেক বেশী গভীরতা লাভ করেছে। সেটা গল্পের বিষয় রীতি সমস্ত দিক থেকেই। এমনকি 'রস' গল্পে আগের দুটো গল্প থেকে ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রেম-মূলক গল্পের ক্ষেত্রে ক্রমশ একটা উত্তরণের দিকে তিনি অগ্রসর হয়েছে। বস্তুতঃ কল্লোলোত্তর নরেন্দ্রনাথের এই 'রস' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে যৌনচেতনা। মোতালেফ ফুলবানুকে চায় তার দেহকে পাবার জন্য, আর এই কারণে যাজু খাতুনের সরলতার সুযোগ নিয়ে তার ভালোবাসাকে পদদলিত করে। 'এক পরিশীলিত মার্জিত ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষা গুণেই এই গল্পের যৌনতা কখনও মাত্রা ছাড়ায় না।'[৩১]

কল্লোলের লেখকেরা যৌনতার ক্ষেত্রে যে আতিশয্য দেখিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেটা দেখাননি কিন্তু ফ্রয়েড সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ অধিকার ছিল সেটা বোঝা যায় 'চেনাঅহল' 'দেহমন'-এর মতো উপন্যাস থেকেই। 'জন্মদিন' নামে একটি গল্পের মধ্যে ইন্দুভূষণের মুখে শোনা যায় - 'আমাকে দেহবাদী বলে ভুল করবেন না, আমি দেহাত্ম-বাদী, দেহ-ই আত্মা নয় দেহও আত্মা।'[৩২] 'রস' এই দেহকেন্দ্রিক ভালোবাসার আত্মিক উত্তরণের গল্প। মোতালেফ গল্পের শেষে বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রথম যাজু খাতুনের বড় বড় জলভরা কালো চোখ দেখার সময় পেয়েছে তাই কোন ক্ষমা ভিক্ষা করা আর তার হয়ে ওঠে নি। মোতালেফের চোখও জলে আপনি-ই ভেসে যায়। নাদির শেখ তাই যখন বলে - 'আপুন

নিবা গেল কইলকার ?' মোতালেফ উত্তরে বলে - 'না মেঞা ভাই, নেবে নাই' - এই অস্তিম সংলাপটির ঔজ্জ্বল্য সমস্ত গল্পটিকে দ্রুত আলোকিত করে তোলে এবং পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দেয়। পাঠক হৃদয়ও ব্যথিত হতে হতে অকস্মাৎ-ই থমকে দাঁড়ায় এই আলোর উদ্ভাসনে। আর এখানেই গল্পটির রস পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠক অনুভব করে সমাজ ও সম্প্রদায়ের দন্ডী অতিক্রম করে এক না-নেভা আগুনের আলো দাম্পত্যের 'রস'কে জীবনের রসে কতখানি উত্তীর্ণ করে দিয়ে যায়।

১৩৫৫ থেকে ১৩৬০-এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন যেখানে মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করে নিচ্ছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন 'কাঠগোলাপ' (১৩৫৫), 'টিকেট'(১৩৫৬)'টর্চ'(১৩৫৬), 'ফেরিওয়ালা'(১৩৫৬), 'হেডমাস্টার'(১৩৫৬) দ্বিচারিনী (১৩৫৬) পূর্ববঙ্গের পরিবেশ লেখকের বিভিন্ন গল্পের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে এসেছে। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ-ই নয়, দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের বেদনা, মুখের ভাষাটুকুও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উদ্বাস্তু হয়ে আসা, মানুষেরা শুধু এক দেশ থেকে অন্য দেশেই আসেনি, পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের এতোদিনের সঞ্চিত ধারণা, - মূল্যবোধ, বিশ্বাস সব কিছুকেই পাল্টে নিতে বাধ্য হয়েছে। 'কাফ্কার মেটামরফসিস'-এর মাকড়সায় রূপান্তরিত হয়ে যাবার মতো নরেন্দ্রনাথের গল্পে 'হেডমাস্টার' হয়ে যায় কেরানী, গ্রামের বধূ রূপান্তরিত হয়ে যায় ঝিয়ে। কেউ কেউ অবশ্য পুরনো অভ্যাস, জীবন ভুলতে পারেনি। লেখকের নিজেরও অবচেতন মনে এই পিছনে ফেলে আসা জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার 'হেডমাস্টার' গল্পে পুরনো ছাত্রকে অবলম্বন করে ব্যাংকের চাকরি পেয়েও অফিস ছুটির পর তিনি বেয়ারাদের মাস্টারীই করেছেন। যদিও তিনি বলেছেন - 'কেরানী গিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজি আছি।' বোঝাই যায় উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষেরা বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় কতখানি অসহায়। 'দ্বিচারিনী' গল্পে অসুস্থ স্বামীর

পরিচর্যার জন্য ফরিদপুরের গ্রামের বধূ তরঙ্গকে ঝি-এর কাজ নিতে হয়। কিন্তু সে শহরের আর পাঁচজন ঝি-এর মতো হয়ে উঠতে পারে না। যুদ্ধকালীন নগর জীবন ধরা পড়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণে। যারা বাঁচার জন্য ঘর ছেড়েছে তার সেই সঙ্গে মিথ্যে সম্ভ্রমবোধকেও ছেড়েছে। 'ফেরিওয়ালা' গল্পে দেখি মধ্যবিত্তের মনোভাব বিসর্জন দিয়ে প্রফুল্ল ফেরিওয়ালার কাজ নিয়েছে। আবার 'কাঠগোলাপ' গল্পে দেখা যায় ফেলে আসা গ্রামের জন্য দুঃখ এবং শহরবাসের আনন্দ। স্ত্রী অনিমা পাকিস্থানের জন্য দুঃখ করলেও শহরবাসের আনন্দ তাকে ঢেকে দেয় আবার স্বামী নীরদ বছর দশেক শহরে থাকলেও গ্রামের বাঁশের ঝাড় গাছের ছায়া মনকে ছেয়ে ফেলেছে। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাগরিক মানসিকতা যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে ছিল সেটা তার এই দ্বিতীয় পর্যায় গল্পগুলি থেকেই বোঝা যায়। কলকাতা ক্রমশ, তার কাছে প্রিয় জায়গায় হয়ে উঠেছিল। 'কাঠগোলাপ' গল্পে হারানো গ্রামজীবনের জন্য দুঃখ আর নগর জীবনের প্রতি ভালোবাসা উভয়ই একত্রে স্থান পেয়েছে। যেটা বিভূতিভূষণের মধ্যে বা তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে ছিল না। তারা কখনোই পুরোপুরি নগর মানসিকতার হয়ে উঠতে পারেননি। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প রয়েছে যেখানে সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভব বেদনা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। যেমন 'টিকিট'(১৩৫৬) শাল (১৩৫৬) টর্চ (১৩৫৬) পালঙ্ক (১৩৫২) একপো দুধ (১৩৫২) দশটাকার নোট (১৩৫২) জামা (১৩৬০) ইত্যাদি গল্পগুলি। সবগুলি গল্পই যে অসাধারণ হয়েছে তা নয় কিন্তু কিছু গল্পে বস্তু তার বস্তুত্বকে ছাড়িয়ে অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের বহুগল্পেই কলকাতা তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে যেমন 'টিকেট' গল্পটিতে রয়েছে ট্রাম-যাত্রী এবং টিকেট ফাঁকি দেবার দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে একটি করুণ কাহিনী। শহরের জীবন যাত্রার মধ্যে যে একটা ক্রমিক পরিবর্তন আসছে সেটা বেশ কিছু লেখকের লেখাতেই রূপ পেয়েছে, নরেন্দ্র-নাথ মিত্র ও এই সব লেখকদের মধ্যে অন্যতম।

আবার সামান্য একটি 'শাল' দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে স্মৃতির কাটার মতো জেগে থাকে যাকে কিছুতেই অতিক্রম ও করা যায় না আবার মনে রাখতেও চায় না কেউ। অন্যত্র একটি 'পালঙ্ক'-কে ঘিরে দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে থাকা মানুষের অন্তরের যোগ-ই বড় হয়ে ওঠে। পালঙ্ক গল্পে পালঙ্ককে ঘিরে ধনী রাজমোহনের কাছে দরিদ্র দিনমজুর যকবুলই আপনজন হয়ে ওঠে। এক অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রীতি সম্পর্কের কথা রয়েছে এই গল্পে। এখান থেকে বোঝা যায় নরেন্দ্রনাথ প্রকটভাবে নয় কিন্তু প্রখরভাবে সমাজ সচেতন ছিলেন। দরিদ্রজনিত অসহায়তার কথা রয়েছে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বহু গল্পে তার মধ্যে 'দশটাকার নোট' 'জামা' উল্লেখযোগ্য। 'দশটাকার নোট'(১৩৫১) গল্পটিতে মানুষের দারিদ্র্য জনিত অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'জামা' গল্পটিতে ধনী দরিদ্রের সামাজিক মানসিক এবং অর্থনৈতিক বিভেদ স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিদেশী বিখ্যাত ছোট গল্পকার 'গোগলের' 'ওভারকোট' গল্পেও একটি সামান্য বস্তুকে নিয়েই গল্প রচিত হয়েছে . কিন্তু সেখানে রয়েছে দরিদ্র মানুষটির অভিমানের সঙ্গে প্রতিবাদ করার চেষ্টা। তাই ঘরে গিয়েও সে ধনী মানুষটিকে ছেড়ে দেয় না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এই গল্পে রয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষের অভিমান, পরিবেশের কাছে তার নতিস্বীকার এবং পরিচিত ধনী ব্যক্তিদের প্রতি তাদের স্বাভাবিক দ্বিধান্বিত মানসিকতা।

তৃতীয় পর্যায় (১৩৬১-৭০)

তৃতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে নরেন্দ্রনাথ বিষয়ের দিক দিয়ে বেশ বৈচিত্র্য এনেছেন, যা প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে সেভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ তার লেখায় ক্রমশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন এই পর্যায়ের বেশ কিছু গল্পে রয়েছে বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তরুণীর প্রাথমিক শ্রদ্ধা যা ধীরে ধীরে আকর্ষণে পরিণতি লাভ করেছে।

যেমন 'ছাত্রী' (১৩৬১) 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৮) 'সম্মোহন' (১৩৬৮), 'ছাত্রী' গল্পে প্রৌঢ় অধ্যাপক তরুণী ছাত্রী মীরার প্রতি ঈষৎ আকৃষ্ট হন। প্রৌঢ় অধ্যাপকের অনুকম্পা মিশ্রিত আকর্ষণ এবং ছাত্রী মীরার শ্রদ্ধা ক্রমশ প্রগাঢ় প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তার গল্পে এই জাতীয় ভালোবাসার কথা থাকলেও দ্বিধান্বিত একটা দূরত্ববোধ থেকে গেছে। কখনো বিরূপ মানসিকতা থেকেও প্রৌঢ়ের প্রতি তরুণীর আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পে দেখা যায় মায়ের প্রৌঢ় বন্ধুকে অপছন্দ করতো রিনি, তার কাছ থেকে ফুল উপহার পেয়ে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য আবিষ্ট হয়ে গেলেও রিনি কিন্তু পরে ঘৃণায় লজ্জায় নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয় - এ কাকে সে জয় করেছে, এ জয় তো তার কোন গৌরব নেই। নরেন্দ্রনাথ মানব-মানবীর মনের অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্বের দিক তুলে ধরেছেন, কিন্তু এ ধরনের ভালোবাসায় তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি। প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রতি নারীর এই আকর্ষণকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথের অনেক পূর্বের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসে এ ধরণের প্রেমকে কখনোই সমর্থন করেন নি, কুন্দকে তাই আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' অথবা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত তে এ ধরণের না-সামাজিক প্রেমের আভাস পাওয়া গেলেও তা অত্যন্ত কোমল মধুর, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার ৬০'এর দশকের এই জাতীয় প্রেমের গল্পে কাউকে সমর্থন বা অসমর্থন করেননি।

এই পর্যায়ে বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছেন যৌনবাসনাকে কেন্দ্র করে অথবা যৌন বাসনা কীভাবে বিকারের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয় সে বিষয়ে। যেমন 'ঘাস' (১৩৭০) পার্শ্বচর (১৩৬৭) ইত্যাদি গল্পে তিনি মানুষের অবদমিত যৌন প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন, অবদমিত আকাঙ্ক্ষার যে সংকট তাকেও তুলে ধরেছেন। 'ঘাস' গল্পটিতে নারীর সন্তান কামনার তীব্রতা এবং স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের জটিল

পরিস্থিতি একসঙ্গে মিলে সুনন্দার মধ্যে এক বিকারগ্রস্থ নারীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু লেখক এমনভাবে তাকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে এই নারীর প্রতি পাঠকের একটা স্বাভাবিক -সহানুভূতি থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ যখন এ ধরণের গল্প লিখেছেন সে সময় বিশ্ব-সাহিত্যেই দেখা যায় মানসিকভারসাম্যহীন চরিত্রকে কথাসাহিত্যে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা আসছে। স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্রনাথের গল্পেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের চরিত্ররা স্থান পেয়েছে। তবে মনস্তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'সরীসৃপ' বা প্রেমেন্দ্র মিত্র 'হয়তো' ইত্যাদি গল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন সে ধরণের প্রয়াস নরেন্দ্রনাথে দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের পর তিনি অন্যতম লেখক যিনি নারীকে সহানু-ভূতির দৃষ্টিতে উপস্থিত করেছেন তার গল্পে। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 'আবহমান' পত্রিকায় 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র' সংখ্যায় লেখকের স্ত্রী শোভনা মিত্র বলেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে নরেন্দ্রনাথ নারী প্রগতিবাদে বিশেষ তৎপর ছিলেন, 'গ্রামের গতানুগতিক পরিবেশে আমার জীবন যেন একঘেয়েমি না আসে ঘর-সংসারের কাজ আর কর্তব্যের মধ্যেই আমি যেন ফুরিয়ে না যাই, সেদিকে আমার স্বামীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সংসারের গন্ডীর মধ্যে আমার চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে।" [৩৩] নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীরা উন্নত চেতনা, চিন্তাশক্তি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে। তার প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে নারীরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বা চাকরীর ক্ষেত্রে স্বমনোনীত ব্যক্তিকে জীবনে গ্রহন করছে ঠিকই - কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একটা - দ্বিধাকম্পিত পদক্ষেপ দেখা যায় সে সবক্ষেত্রে। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ে এসে এই সব নারীরা অনেক বেশী প্রগতিশীলা বলে মনে হয় অর্থাৎ যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হল নরেন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নারীরা নিজ বিশ্বাসের স্বপক্ষে থেকে জীবনে লড়াই করছে। পরিবারে অভিভাবকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে বলিষ্ঠ ভাবেই। অর্থাৎ সমাজের নারীর অবস্থার যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা নরেন্দ্রনাথের লেখার পরিবর্তনের মধ্যেও ধরা পড়েছে। 'বিকল্প'

(১৩৬২) গল্পে কুমারী সুধা আত্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে প্রেমিক ইন্দভূষণ-এর মৃত্যুর পর বৈধব্য অবলম্বন করেছে। অথবা 'স্বাধিকার'(১৩৬২) গল্পে বীথিকা পিতামাতার অমতে নিজের পছন্দের পাত্রকে অসবর্ণ-বিবাহ করছে। 'পুরাতনী' গল্পে (১৩৬৩) চিত্রা নিজ বিশ্বাসে অচল থেকে বাড়ীর - চাকর অভয়কে বিয়ে করলো। সমাজ মানসের সামগ্রিক যে পরিবর্তন ঘটছে সেটা অনেক স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে 'ললাটের রঙ'(১৩৬১) গল্পে বিধবা অঞ্জলীর সহকর্মীরা সবাই চায় অবিবাহিত সুরেন তাকে বিয়ে করুক। অথবা 'সুদ'(১৩৬৭) গল্পে দেখি - "সেদিন আর নেই মশাই। দেওর ভাসুর বিধবা ভাই বউকে পুষবে, ... আজেকাল মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাড়াবার চেষ্টা করে,খুব ভালো মশাই।" [৩৪] - এটা নরেন্দ্রনাথেরও মনেরই ভাষা। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 'আহ্লাদিনী' (১৩৭০) গল্পে বীথিকা আপন ব্যক্তিত্বের জোরে ভালোবাসাকে জয় করেছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা, ভাবনা, তার চরিত্র ভাবনার জগৎ আচরণ, ব্যক্তিত্বকে যে ক্রমশ বদলে দিচ্ছে সেটা নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই ফুটে উঠেছে। তার গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিবর্তনের ধারাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

চতুর্থ পর্যায় বা শেষ পর্যায় (১৩৭০-৮২)

শেষ জীবনে গ্রামাঞ্চল থেকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তার গল্পগুলিতে গ্রামজীবন অপেক্ষা নাগরিক জীবনের কথাই অধিক পরিমাণে উঠে এসেছে। তার গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নরনারীর সম্পর্কের নানাদিক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল বাঙালী নিম্নবিত্ত এবং পরে মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখেছেন বলে বিষয়বস্তুতে খানিকটা পৌনঃপুনিকতা এসেছে তার গল্পে। যেমন 'জয়ন্তী'(১৩৭৩) 'পুনরাবৃত্তি'(১৩৭৬)'কোন দেবতাকে'(১৩৮২) ইত্যাদি গল্পে পূর্বের কিছু গল্পে ব্যবহৃত সেই বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তরুণীর আকর্ষণ সংক্রান্ত গল্প লিখেছেন। আবার 'ভালোবাসা'(১৩৭৩) গল্পে সুধা পর পুরুষের সঙ্গে একদিন চলে যায়। কিছু

বছর পরে লেখা 'ফিরে দেখা'(১৩৮১) গল্পেও সর্বানী পরপুরুষের সঙ্গে চলে যায় স্বামীকে পরিত্যাগ করে। 'আরোগ্য'(১৩৭৩) গল্পে ক্যানসার থেকে সেরে ওঠে পরিমল, কিন্তু স্বাভাবিক চেহারা সে পায় না তাই বিকৃত চেহারা নিয়ে প্রেমিকাকে সে অধিকার করতে চায়না। 'খুঁৎ'(১৩৮০) গল্পেও নন্দিতা জন্মের মতো একটানা অকেজো নিয়ে প্রেমিক দিব্যেন্দুর সঙ্গে মিলতে চায় না।

নরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ের কিছু গল্পে নৈরাশ্য, সুগভীর নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে এসেছেন যেমন 'নিরুদ্দেশ'(১৩৭৪) 'ফিরে দেখা'(১৩৮১) ইত্যাদি গল্পে। 'নিরুদ্দেশ' গল্পের প্রনবেশ জীবনবীমা অফিসে নিযুক্ত ছিল, এলোমেলো নানারকম আত্মিক জল্পনা-কল্পনার ফলে এক ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাড়িত হতে হতে একধরণের উন্মাদ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। 'ফিরে দেখা' গল্পেও কেন্দ্রীয় চরিত্র একধরণের একাকীত্বে ভোগে, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। অনেকের মতে নরেন্দ্রনাথ - "আর একটু দীর্ঘায়ু হলে তিনি বোধ হয় আরো বেশি নিঃসঙ্গতার গল্প লিখতেন।" [৩৫] আত্ম পরিচয় মানুষ যে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে সে প্রসঙ্গ রয়েছে তাঁর 'মুখোশ'(১৩৭৮) গল্পে। এ গল্পে দেখা যায় শ্রীমন্তবাবু হঠাৎই অনুভব করলেন, তিনি তার পরিচিত জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন, পরিচিতদের কাছে তিনি অপরিচিত হয়ে উঠছেন, এবং একটা সময়ে অনুভব করলেন "আমি আমার আইডেনটিটি হারিয়ে ফেললাম নাকি ?" - যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই আত্মপরিচয় হারিয়ে মুখোসের আড়াল নিয়ে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্পের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নিঃসঙ্গতা, সেই নিঃসঙ্গতা এই 'মুখোস' গল্পেও পাঠক দেখতে পায়। এ গল্পেও একটি মানুষ তার আত্ম পরিচয় হারিয়ে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। এই নিঃসঙ্গতা এবং প্রত্যাশের ব্যবধান দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের 'বিকালের আলো'(১৩৮২) গল্পে। এ গল্পে দুটি নর-নারী পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের শেষ বেলায় এসে নিজেদের নিঃসঙ্গতাকে অনুভব

করে। সেই সঙ্গে অনুভব করে নতুন কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও তাদের পক্ষে কঠিন কাজ, তাই মনোরমা বলে " সবচেয়ে বড় কথা বনিবনা হচ্ছেনা নতুন কালের সঙ্গে। আমরা এখন সেকেলে হয়ে গেছি। " নতুন যুগে, নতুন সমাজে এই প্রজন্মের ব্যবধান যে ক্রমশই বৃহৎ হয়ে উঠছে সেটা নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, যার প্রভাব তাঁর রচনার ক্ষেত্রেও পড়েছে।

৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা বৈশিষ্ট্য :

নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলো অধিকাংশই গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনের ওঠানামা, পরিবর্তন, পাওয়া-না-পাওয়ার কথাকে অবলম্বন করে। গল্পের চরিত্ররা তাই স্বাভাবিক ভাবেই অসাধারণ কেউ নয়। এই সব চরিত্রের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথের ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রয়োজনে তিনি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে। তার গল্পগুলিতে 'ঘটনায় চমক নেই। আছে তাৎপর্য। ... অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য নরেন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি রচনাকেই দিয়েছে বিদ্যুৎচমকের দীপ্তি।'[৩৬] তার বেশ কিছু গল্পেই এক ধরণের অতীতচারণা (নস্টালজিয়া) দেখা যায়। তার গল্পবলার ভঙ্গীটি নিরুদ্বেজ, 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করেননি তিনি।'[৩৭] বরং প্রাত্যহিক জীবনের চলা ফেরাতে মানুষের যে বিচিত্র অনুভব, তাকেই তিনি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন পাঠকের মনের অতলে।

নরেন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গল্পই উত্তমপুরুষে বলা হয়েছে। তার বলে যাওয়ার ধরণ আত্মকথনের মতো। যেমন তার অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'হেডমাস্টার'-এ শুরু হয়েছে - "টাইপ করা কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম।" [৩৮] অথবা 'নাম' গল্পে - "স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম ...।"[৩৯]

নরেন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন - 'ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রনাথের গদ্য আকর্ষণীয়, ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগে স্বল্প ভাষায় তিনি পাঠকমনকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন।'[৪০] নরেন্দ্রনাথের গল্পে বাস্তবিকই দীর্ঘ সংলাপ খুবই কম। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যেই তিনি - নর-নারীর জীবনের গভীর দুঃখবেদনা, আনন্দের অনুভূতিকে বিদ্যুৎছটায় উদ্ভাসিত করেছেন। নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন -

> নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আঙ্গিক আর ভাষার বিন্যাস যেমন সূক্ষ্ম কারুকার্য -মণ্ডিত তেমনি তার গল্প বলার ধরণটিও অতি মনোরম। তাঁর গল্পে উপজীব্য চিত্র ও চরিত্রে সমাজ বাস্তবতা তথা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কারুকার্য যেমন নেই, তবু সব জড়িয়ে তাঁর গল্পের আবেদন স্নিগ্ধ আর ওইখানেই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।[৪১]

প্রয়োজনে তিনি গল্পের চরিত্রের মুখে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছে, সেটা হয়তো মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের কাব্যপঙ্‌ক্তি বা বাক্য অনায়াসে তিনি গল্পে ব্যবহার করেছেন - যেমন 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো।' রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে নরেন্দ্রনাথ মনের গভীরে স্থাপন করেছিলেন, সেকারণেই তার গল্পের মধ্যে রবীন্দ্র কাব্যপঙ্‌ক্তির খুব সহজভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যঞ্জনা গভীর প্রতীকী ভাষা ব্যবহার নরেন্দ্রনাথ মিত্র করেননি। বরং ভাবে এবং ভাষায় তিনি অনেকটাই শরৎচন্দ্রের অনুসারী। গল্পের শুরু বা সমাপ্তিতে তিনি পাঠককে চমক দেবার চেষ্টা করেননি। গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের খুব তুচ্ছ বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করেই তার গল্প। এই তুচ্ছ বস্তু বা বিষয়ই তার গল্পের শিরোনাম হয়েছে, যেমন 'রস', টর্চ', 'শাল' - ইত্যাদি। এই নামের মধ্যেই তিনি গল্পরসকে ঘন-সংঘবদ্ধ করেছেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন নিরন্তরঙ্গ প্রবাহ যেন তার গল্পের রচনারীতিতে সাকার হয়ে উঠেছে। তার অনেক গল্পের পরিসমাপ্তিতে অনুভূতির একটি সূক্ষ্ম যোচড় পাঠক উপলব্ধি করে। যেমন 'স্রোতস্বতী' 'পার্শ্বচর', 'মহাশ্বেতা' ইত্যাদি গল্পে লেখকের অনুচ্ছসিত, নিরুত্তাপ বর্ণনাভঙ্গি দেখা যায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর গল্পগুলোতে আমরা পেয়ে যাই। 'বাঙালী নিম্নবিত্তের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সফল রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। - তার গল্পের রচনারীতিতে দেখা যায় " গল্পের শেষ হয়ে যাওয়া আর অকথিত অন্তিম অর্থটি হঠাৎ ঝলকিত হয়ে ওঠা, দুই-ই যেখানে একসঙ্গে ঘটে.- সংশয় নেই, প্রশ্ন নেই ব্যাখ্যা নেই, বাক্য নেই, এই আর্টে নরেন্দ্রনাথের সিদ্ধি অবি-সংবাদিত।" [৪২] যেমন 'অনধিকারিনী' গল্পের শেষে গানের আসরে ব্যর্থ হয়ে আসরের বাইরে দাঁড়িয়ে সুলতা তার সঙ্গীত শিক্ষককে ধীরকণ্ঠে বলে - 'ভিতরে আর যেতে পারলাম কই।' - এই উক্তি লেখক অত্যন্ত সংযত শান্ত ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। অথবা 'রস' গল্পে হুঁকোতে মুখ দিয়ে নিরীহভাবে মোতালেফ বলল 'না, যেঞাভাই, নেবে নাই'। আবার এই নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ ভঙ্গীতেই 'জামা' গল্পে লেখক আত্মধিক্কারে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া হতদরিদ্র বস্তিবাসী মুদি-দোকানের কর্মচারী যতীনের মর্মবেদনাকে লেখক তুলে ধরেছেন। আপাতশান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনের এমন সার্থক গল্পকার বাংলাসাহিত্যে খুব কমই এসেছেন।

তথ্যপঞ্জী

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আত্মকথা' - আবহমান ভাঙাঁ, সম্পাদক-সাদকামালী, পঙ্কজ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ৪১

২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'অন্যমা', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয়, ১৩৮৭, পৃ·৫৮৯

৩. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ·২

৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - 'নিঃশব্দ প্রবেশ নিঃশব্দ প্রস্থান : কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র' শিল্প সাহিত্য দেশকাল, ১৯৮১, পৃ·১৭৩

৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'অন্য মা', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, ১৩৮৭, পৃ· ৫৮৯

৬. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আমাদের কথা', ১৯৫১

৭. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আত্মকথা, আবহমান ভাঙাঁ, সম্পাদক সাদকামালী, পঙ্কজ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃ·

৮. তদেব, পৃ·৫৩

৯. তদেব, পৃ·৫৩

১০. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - নিঃশব্দ প্রবেশ : নিঃশব্দ প্রস্থান - কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র - শিল্পসাহিত্য দেশকাল, ১৯৮১, পৃ·১৮৪

১১. তদেব, পৃ·১৭৪

১২. হরপ্রসাদ মিত্র - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদক - সঞ্জীবকুমার বসু - ১৪০০, পৃ·১৩৬

১৩. রণজিৎকুমার সেন - প্রসঙ্গঁ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা, ৯ম ও ১০ম, ১৯৯৪, পৃ·৪০৭

১৪. শোভনা মিত্র - আমার স্বামী নরেন্দ্রনাথ - আবহমান ভাঙাঁ, পঙ্কজ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৯, সম্পাদক - সাদ কামালী, পৃ·৫৮

১৫. তদেব, পৃ.৬১

১৬. সমরেশ বসু - মৃত্যুহীন বিয়োগ, দেশ ১১ই অক্টোবর, সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, ১৯৭৫, পৃ.৮৪০

১৭. বীরেন্দ্রনাথ মিত্র - পায়ে পায়ে যার গল্প, মাসিক বাংলা দেশ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ও ১০ম, ১৯৯৪, পৃ.৪৬১

১৮. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য - নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ.১০

১৯. মিহির আচার্য - তিনশূন্য - মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ - ১ম ও ১০ম সংখ্যা, পৃ.৪২০

২০. সমীর মুখোপাধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ১ম ও ১০ম, পৃ.৪১০

২১. সরকার আমিন - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - আবহমান ভাঙা, সম্পাদক - সাদকামালী, পঞ্চম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯১, পৃ.১৬

২২. আকিমুন রহমান - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দ্বীপপুঞ্জ, আবহমান ভাঙা, সম্পাদক - সাদ কামালী, পঞ্চম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৯১, পৃ.২

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - নিঃশব্দ প্রবেশ : নিঃশব্দ প্রস্থান, শিল্প সাহিত্য দেশকাল ১৯৮১ পৃ.১৭১

২৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আবরণ' - নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা ৩, ১৯৯২, পৃ.৩৩

২৫. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় - দুঃশাসনীয়, আজকাল পরশুর গল্প, মাণিক গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড, ১৯৮২, পৃ.২৭১

২৬. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - কুমারী শুক্লা, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা, ৪র্থ খন্ড ১৯৯৪, পৃ.২৬

২৭. সমীর ঘোষ - পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পে সাহিত্যে, ১৯৯৪, পৃ.৪২

২৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - আবরণ - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ৩য় খন্ড, ১৯৯২, পৃ.৩৩

২৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - বস্ত্র, কাঠ, খড় - কেরোসিন, পৃষ্ঠা ২৩৯, বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা, ১৩৬৩

৩০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - দুঃশাসন - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ.৬০

৩১. কবিতা চন্দ - রস: একটি অনির্বাপিত গল্প - সাহিত্য সংস্কৃতি, শ্রাবণ পৌষ ১৪০০, নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি সংখ্যা, সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু, পৃ.১৭৭

৩২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'জন্মদিন' - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.৪১৯

৩৩. শোভনা মিত্র - আমার স্বামী নরেন্দ্রনাথ, আবহমান ভাঙা, পঙ্কয় সংখ্যা, ১৩৯৯, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদক - সাদ কামালী, পৃ.৬৮

৩৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'সুদ', সুরসন্ধি, আরতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭, পৃ.৬৬

৩৫. হরপ্রসাদ মিত্র - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - সাহিত্য সংস্কৃতি, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ.১৩৮

৩৬. দিব্যেন্দু পালিত - দেহ মনের বৈতালিক, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ.২৬৭

৩৭. সুরাবাণ বসু রায় - 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্প' - ভাঙা কাচের শিল্প, সম্পাদক - অর্জুন রায়, পৃ.১৩৩

৩৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'হেডমাষ্টার - গল্পমালা ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.১৪৩

৩৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'নাম', গল্পমালা - ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.৫২

৪০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত - নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আনুষঙ্গিক ভাবনা, মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম ও ১০ম, পৃ.৪০৩

৪১. নারায়ণ চৌধুরী - ছোটগল্প - কথাসাহিত্য, ভাদ্র ১৩৭০, পৃ.৩৬

৪২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ১৯৯৫, পৃ.৩৮৬

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গ্রন্থপঞ্জি

গল্প সংকলন ও সূচী :

১। অসমতল : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশার্স)
নেতা, চোর, লালবাবু, মদন ভস্ম, রসাভাস, স্পর্শ, আবরণ, সত্যাসত্য, রূপান্তর, পুনশ্চ, চোরাবালি, ফেরিওয়ালা।

২। হলদে বাড়ি : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২, অগ্রণী বুক ক্লাব)
যৌথ, শম্বুক, যযাতি, সুখাত, রোগ, মহাশ্বেতা, কুমারী শুক্লা, পুনরুক্তি, হাসপাতাল, সিঁদুর, হলদে বাড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বী, মালঞ্চ।

৩। উল্টোরথ : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩, মিত্র ও ঘোষ)
উল্টো রথ, প্রথম বসন্ত, চাঁদ মিঞা, সংক্রামক, যথাস্থান, পাথরের চোখ, স্ফুলিঙ্গ, সৌরভ, দুর্জয়, সেতার, পটক্ষেপ।

৪। পতাকা : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৪, পূর্ব্বাশা লিমিটেড)
ক্রৌঞ্চ মিথুন, পদক, নাম, কুলপী বরফ, ঘুষ, পতাকা।

৫। চড়াই-উৎরাই : (তারিখ উল্লেখ নাই, মিত্রালয়)
রস, অবতরণিকা, জৈব, হেডমাস্টার, হেডমিস্ট্রেস, চড়াই-উৎরাই।

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৯, মিত্র ও ঘোষ)
সেতার, দ্বিচারিনী, অনধিকারিনী (বড়গল্প), চোর, যৌথ, মহাশ্বেতা, পুনশ্চ, চাঁদমিঞা, কুলপী বরফ, রস, নাম, হেডমাস্টার, দাম্পত্য।

৭। কাঠগোলাপ : (প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ)
বেহালা, পালঙ্ক, ডুবন ডাক্তার, টর্চ, কাঠগোলাপ, শুক, ছায়া, এক পো দুধ।

৮। অসবর্ণা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬১, এম·সি·সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড)
অসবর্ণা (বড়গল্প), পুনর্ভবা (বড় গল্প), দয়িতা (বড়গল্প)

৯। মলাটের রং : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড)
কন্যা, রানু যদি না হতো, চিঠি, লেখিকা, একস্-রে, পুনশ্চ, আকিঞ্চন, ছাত্রী, মলাটের রং।

১০। দীপান্বিতা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩, ক্যালকাটা পাবলিশার্স)
স্বাধিকার, সুতপা, ঋণ, জামা, হার, সুহাসিনী তরল আলতা, ঘর, দীপান্বিতা।

১১। রুপালী রেখা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩, আভেনির)
টেপরেকর্ড, দর্শক, অদ্বিতীয়া, সুপুরুষ, বিভ্রম, টিকেট, প্রতিভু, এপার-ওপার, সন্ধান, চাঁদা, ছবি, ঘড়ি, স্মৃতিগন্ধ, কেরামত।

১২। একুল ওকুল : (প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৬৩, প্রচারিকা)
রাজধানী, সুদর্শন চৌধুরী, সম্ভ্রম, ভক্ত, গহনা, অপঘাত, রাজপুরুষ, একুল ওকুল।

১৩। ওপাশের দরজা : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৩, লিটল পাবলিশার্স)
নতুন প্রেম, দশ টাকার নোট, আলপিন, আবিষ্কার, মিশ্র রাগ, ছোট দিদিমণি, ক্যালেন্ডার, পেশা।

১৪। বসন্ত পঙ্কজ : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, নাভানা)
বসন্ত পঙ্কজ, চিহ্ন, মহড়া, জামাই, গোঁড়ার, যবনিকা।

১৫। উত্তরণ : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৫, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স)
সংস্কারক, সহদেব, মৃত্যু, পণ্ডিতমশাই, পুরোন বাসা, জাল, বাসনা বিপুল, উত্তরণ।

১৬। পূর্বতনী : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৫, গ্রন্থপীঠ)
পূর্বতনী, মর্যাদা, সন্ধান, প্রিয়তম, অপছন্দ, সিগারেট, যৎসামান্য, রত্নাবাঈ।

১৭। অঙ্গীকার : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, রবীন্দ্র লাইব্রেরী)
জয়ন্তী, বিকল্প, অঙ্গীকার, চেক।

১৮। রূপসজ্জা : প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬, নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
রূপসজ্জা, দ্বৈত, দুই লেখক, পাত্রী, পুরাতনী।

১৯। সভাপর্ব : (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৬৭, ডি·হাজরা এন্ড কোং)
সভাপর্ব, পরিচয় পত্র, দাম্পত্য, একটি চিত্র কাহিনী, পার্শ্বচর, পলাতক, আগামীকাল।

২০। সুরসন্ধি : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৭, আরতি প্রকাশনী)
সুরসন্ধি, রেখা, উপনয়ন, সেই মুখ, দূত, সুদ, গ্রন্থি, যযাতি, ক্যামেরা।

২১। ময়ূরী : (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
ময়ূরী (বড়গল্প), চিত্রশালা, বাসি বকুল, শাল, বন্দিনী, মালা, অনাহূত, দ্বিরাগমন, কুশাঙ্কুর ঝড়।

২২। বিদ্যুৎলতা : (প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬৮, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস)
বিদ্যুৎলতা (বড় গল্প), জমি, পরীক্ষা, মরুদ্যান, অভিসার

২৩। পত্রবিলাস : (প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৮, সুরলি প্রকাশনী)
শ্বেতময়ূর(বড়গল্প), দোলা, সহযাত্রিণী, শুভার্থী, সোহাগিনী, পত্রবিলাস (বড় গল্প), জন্মদিন।

২৪। একটি ফুলকে ঘিরে : (প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৯, কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
একটি ফুলকে ঘিরে, খুঁৎ, সম্মোহন, একটি মৃত্যু ও আমি, দুর্গ, সন্ধান।

২৫। যাত্রাপথ : (প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯, মিত্র ও ঘোষ)
যাত্রাপথ (বড় গল্প), যাত্রাশেষ (বড় গল্প)।

২৬। সুধা হালদার ও সম্প্রদায় : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স) সুধা হালদার ও সম্প্রদায়, বিলম্বিত লয়, বন্ধুসঙ্গ, ঝরের পরে।

২৭। রূপ লাগি : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭০, ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং কোং) রূপলাগি, বন্ধন, বিবেক, পূর্বরাগ, দাতা, অন্য গল্প, ছাতা, মৎসরাজ, পেশা, মালা।

২৮। চিনে কোঠা : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১, নূতন সাহিত্য)
চিনে কোঠা, ফিরে লেখা, বোধন, বঞ্চনা, দুর্বল মুহূর্ত, প্রজাপতি, মর্মর মূর্তি।

২৯। প্রজাপতির রং : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭২ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
প্রজাপতির রং (বড় গল্প), মুক্তি-পণ, শিখরে সুখ।

৩০। অন্য নয়ন : (প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭২, এম·সি·সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড)
অন্য নয়ন, অন্য জীবন, অনন্যা।

৩১। বিবাহ বাসর : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড)
বিবাহবাসর (বড় গল্প), জ্বালা, নতুন ভূমিকা।

৩২। চন্দ্রমল্লিকা : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, রবীন্দ্র লাইব্রেরী)
চন্দ্রমল্লিকা, আরোগ্য, ভালোবাসা।

৩৩। সন্ধ্যারাগ : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
সন্ধ্যারাগ, প্রবাস, হলাদিনী, রূপ, অনুচ্চ, মাঝদরিয়া একটি প্রেমের উপাখ্যান, ভগ্নাংশ, বন্ধ দরজা।

৩৪। সেই পথটুকু : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৬, ডি·এম·লাইব্রেরী)
সেই পথটুকু (বড় গল্প), নতুন ভুবন (বড়গল্প)।

৩৫। অনাগত : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
অনাগত, অন্যস্বাদ, পুনরাবৃত্তি, অভিসার, দ্বিতীয় অধ্যায়, নিরুদ্দেশ, দুই যোদ্ধা।

৩৬। পালঙ্ক : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, জ্যোতি প্রকাশন)
পালঙ্ক, স্রোতস্বতী (বড় গল্প)।

৩৭। উদ্যোগ পর্ব : (প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
কোন দেবতাকে, অভিন্ন হৃদয়, হাসি, গণ্ডী, মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষা, তৈলচিত্র, অপরাধিনী, বীতশোক, ফিরে দেখা, গৃহকাতর, মাধবীমঞ্জরী(বড়গল্প), উদ্যোগ পর্ব (বড় গল্প)।

৩৮। বর্ণবহ্নি : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮৪, ঈশান)
ঘায়, নাবিক, বর্ণবহ্নি, ভেনাস, বিস্বাদযোগ, মুখোশ, শোক, বীজ, যিনিবাস।

৩৯। মিসেস গ্রীন : (তারিখ উল্লেখ নেই, সিটি বুক এজেন্সী)
মিসেস গ্রীন, অভিনেত্রী, ঠিকানা, অশ্রুকণা, রূপলাগি, প্রতিদান, মুক্তা, অধিকন্তু, সাম্রাজ্য, সীমানার বাইরে।

৪০। মিশ্ররাগ : (দ্বিতীয় মুদ্রণ : তারিখ নেই, মিত্র ও ঘোষ)
সুপ্তকমল, শুভদৃষ্টি, হকার, বন্যা, স্রোতপত্র, পাণ্ডুলিপি, গোঁফ, পরীক্ষা, শেলি।

৪১। বিকালের আলো : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৯০, শোভনা মিত্র)
লোকশিল্পী, শিকড়, ফটো, ফলশয্যা, ছদ্মবেশ, বাসিফুলের মালা, শোক, বিষাদযোগ, বন্ধন, মুখোস, ঘটক, বিকালের আলো।

৪২। কিশোর গল্পসমগ্র : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)

শোক, অনাথের কীর্তিকলাপ, গুপ্তচর, ময়ূরশঙ্খী, নষ্টচন্দ্র, কুশল, হারান মাস্টার, পলায়ন পর্ব, বাটি চালান, হাল খাতা, কানা বসিরের ঘোড়া, ঘড়ি, মধুচক্র, নাম, পাশা, কুমির থিয়েটার, মোহন বাঁশি, তিলকুচরিত, প্রথম প্রবাস, মনু-কারিনী, বিয়ে বাড়ি।

যে সব গল্প পত্র পত্রিকায় পাওয়া গেছে

(কিছু কিছু গল্প গ্রন্থে সংকলিত এবং কিছু অগ্রন্থিত)

১. মৃত্যু ও জীবন : দেশ, ২০শে ভাদ্র ১৩৪৩
২. লক্ষ্মী : প্রবাসী, ১৩৪৪
৩. রসিক দাস : পরিচয়, ১৩৪৫
৪. পরীক্ষা : প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬
৫. সংসার : আনন্দ বাজার, ১৩৪৬
৬. অসুখ : আনন্দ বাজার, ১৩৪৬
৭. অতীত : দেশ, ১৩৪৬
৮. প্রতিষ্ঠা : দেশ, ১৩৪৭
৯. জটিল : আনন্দবাজার, ১৩৪৭
১০. শম্বুক(হলদেবাড়ি) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৪৯
১১. কুমারসম্ভব : দেশ, ১৩৪৯
১২. পরাজয় : নবযুগ, ১৩৪৯
১৩. কুমারী শুক্লা (হলদে বাড়ি) : দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৪৯
১৪. যৌথ (হলদে বাড়ি) : আনন্দ বাজার, ২৯ পৌষ ১৩৪৯
১৫. দারাপুত্র : দেশ, ১৩৫০
১৬. সীমানা : যুগান্তর, ১৩৫০
১৭. রোগ (হলদে বাড়ি) : আনন্দ বাজার, ১৮ বৈশাখ ১৩৫০
১৮. হাসপাতাল : ভৈরব, ভাদ্র ১৩৫০
১৯. পুনশ্চ (অসমতল) : অরণি, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২০. হলদে বাড়ি (হলদে বাড়ি) — : যুগান্তর, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২১. সৌরভ (উলটো রথ) : অভিযোগ, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২২. প্রতিদ্বন্দ্বী (হলদে বাড়ি) : বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৫০

২৩. মহাশ্বেতা (হলদে বাড়ি) : অলকা, মাঘ ১৩৫০
২৪. দুর্জয় (উলটো রথ) : অলকা, শ্রাবণ ১৩৫১
২৫. নেতা (অসমতল) : অরণি, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫১
২৬. রূপান্তর (অসমতল) : বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৫১
২৭. লালবানু (অসমতল) : কৃষক, ঈদসংখ্যা ১৩৫১
২৮. পুনরুক্তি (হলদে বাড়ি) : ছোটগল্প, অগ্রহায়ণ ১৩৫১
২৯. সত্যাসত্য (অসমতল) : দেশ, পৌষ ১৩৫১
৩০. সুখাত (হলদে বাড়ি) : অলকা, পৌষ ১৩৫১
৩১. চোর (অসমতল) : বসুমতী, মাঘ ১৩৫১
৩২. রসাভাস । বিষম্বর(অসমতল) : বসুমতী, নববর্ষ সংখ্যা ১৩৫২
৩৩. স্পর্শ (অসমতল) : সোনার বাংলা, আষাঢ় ১৩৫২
৩৪. আবরণ (অসমতল) : অরণি, আষাঢ় ১৩৫২
৩৫. সেতার (উল্টো রথ) : বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২
৩৬. উল্টো রথ (উল্টো রথ) : বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২
৩৭. প্রথম বসন্ত (উল্টো রথ) : অরণি, পূজা সংখ্যা, ১৩৫২
৩৮. সংক্রামক (উল্টো রথ) : অলকা, ভাদ্র ১৩৫২
৩৯. যথাস্থান (উল্টো রথ) : পরিচয়, আশ্বিন ১৩৫২
৪০. পাথরের চোখ (উল্টো রথ) : নতুন জীবন, পূজা সংখ্যা, ১৩৫২
৪১. স্ফুলিঙ্গ (উল্টো রথ) : আবাহন, আশ্বিন ১৩৫২
৪২. পটক্ষেপ (উল্টো রথ) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৫২
৪৩. চাঁদ মিঞা (উল্টো রথ) : দিগন্ত বৈশাখ, ১৩৫৩
৪৪. নাম (পতাকা) : দীপায়ন, শ্রাবণ ১৩৫৩
৪৫. মালঞ্চ (হলদে বাড়ি) : সম্ভবত 'হাসপাতাল' নামে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৩৫৩

৪৬. কুলপী বরফ (পত্যকা) : লেখন, ১৩৫৩
৪৭. ত্রৈকথিথুন (পত্যকা) : অলকা, বৈশাখ ১৩৫৪
৪৮. ঘুষ(পত্যকা) : পূর্বাশা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
৪৯. রস (চড়াই-উৎরাই) : চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫৪
৫০. পদক (পত্যকা) : স্বরাজ, ১৩৫৪
৫১. ত্রৈব (চড়াই-উৎরাই) : চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫৫
৫২. ফেরিওয়ালা (অসমতল) : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৬
৫৩. বিদ্যুৎলতা বিজয়িনী (বিদ্যুৎলতা) : ইদানীং, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৪. দ্বিচারিনী (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প) : সত্যযুগ, পূজাসংখ্যা ১৩৫৬
৫৫. অবতরণিকা (চড়াই-উৎরাই) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৬. হেডমাস্টার (চড়াই-উৎরাই) : দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৭. শূক(কাঠগোলাপ) : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৭
৫৮. হেডমিস্ট্রেস (চড়াই-উৎরাই) : দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৭
৫৯. জমি(বিদ্যুৎলতা) : চতুষ্কোণ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৮
৬০. অনধিকারিনী (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প) : আনন্দবাজার, দোল সংখ্যা, ১৩৫৮
৬১. দুঃখের বই : কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩৫৮
৬২. পালঙক (পালঙক) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৫৯
৬৩. চিঠি (মলাটের রং) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬০
৬৪. কন্যা (মলাটের রং) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬১
৬৫. সাম্রাজ্য (মিসেস গ্রীন) : গল্প ভারতী, শারদীয়া ১৩৬৩
৬৬. সমব্যথী : : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৩
৬৭. হরিচরণ : পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৪
৬৮. মোহাগিনী তুফানী (পত্র বিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৪
৬৯. মরুদ্যান (ওয়েসিস) : ভারতবর্ষ, ১৩৬৪

৭০. শুভার্থী (পত্রবিলাস) : দেশ, সাপ্তাহিক ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

৭১. দোলা (পত্রবিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৫

৭২. পত্রবিলাস (পত্রবিলাস) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৬৫

৭৩. বনভোজন : দেশ, সাপ্তাহিক ১৩৬৬
(১১ই এপ্রিল, ১৯৫৯)

৭৪. ময়ূরী (ময়ূরী) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৬

৭৫. পরীক্ষা : মানসী, ১৩৬৭

৭৬. বন্দিনী (ময়ূরী) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৭

৭৭. শ্বেতময়ূর (পত্রবিলাস) : আনন্দবাজার, পূজাসংখ্যা ১৩৬৭

৭৮. মিসেস গ্রীন (মিসেস গ্রীন) : পরিচয়, শারদীয়া ১৩৬৭

৭৯. অভিসার : বসুধারা, ১৩৬৭

৮০. সহযাত্রিণী (পত্রবিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৮

৮১. বিবেক (রূপলাগি) : দেশ, সাপ্তাহিক ২ই অগ্রহায়ন ১৩৬৮

৮২. বোধন (চিলেকোঠা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৯

৮৩. দুর্বল মুহূর্ত (চিলে কোঠা) : দিগন্ত বৈশাখ ১৩৭০

৮৪. চিলে কোঠা (চিলে কোঠা) : আনন্দবাজার, দোল সংখ্যা ১৩৭০

৮৫. হলাদিনী (সন্ধ্যারাগ) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭০

৮৬. একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান : আনন্দবাজার, দোলসংখ্যা ১৩৭১
(একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান)

৮৭. দীপশিখা : দেশ, শারদীয়া ১৩৭১

৮৮. নায়িক (বর্ণবহ্নি) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭২

৮৯. ভালোবাসা (চন্দ্রমল্লিকা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৩

৯০. আরোগ্য (চন্দ্রমল্লিকা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৩

৯১. সন্ধ্যারাগ (সন্ধ্যারাগ) : দেশ, ভাদ্র ১৩৭৪

৯২. ভেনাস (বর্ণবহ্নি) : আনন্দবাজার, রবিবাসরীয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

৯৩. অপঘাত (একূল-ওকূল) : আনন্দবাজার, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৫

৯৪. পুষ্পবিলাস : কথাসাহিত্য, শারদীয়া কার্তিক ১৩৭৫

৯৫. অভিসার (অনাগত) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৬

৯৬. দ্বন্দ্ব : : বসুমতী সাপ্তাহিক, শারদীয়া ১৩৭৭

৯৭. দ্বিতীয় অধ্যায় (অনাগত) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৭

৯৮. কাঁটাতার : দেশ, সাপ্তাহিক ১৩ই চৈত্র ১৩৭৭

৯৯. বন্ধন : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৮

১০০. একাদশী : কথাসাহিত্য, প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৮

১০১. শোক (বর্ণবহ্নি) : দেশ, সাপ্তাহিক ৬ই ফাল্গুন ১৩৭৮

১০২. স্মারক : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৯

১০৩. একটি প্রেমের গল্প : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৯

১০৪. আকাঙ্ক্ষা : দেশ, শারদীয়া ১৩৮০

১০৫. বীতশোক (উদ্যোগ পর্ব) : দেশ, সাপ্তাহিক ২৮শে আষাঢ় ১৩৮১

১০৬. ফিরে দেখা : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৮১

১০৭. কোন দেবতাকে (উদ্যোগ পর্ব) : দেশ, শারদীয়া ১৩৮২

১০৮. অভিন্ন হৃদয় (উদ্যোগ পর্ব) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৮২

১০৯. ইন্দ্রধনু : উল্টোরথ, নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা বৈশাখ ১৮৮৯

উপন্যাস ও বড়গল্প -

১. দ্বীপপুঞ্জ (হরিবংশ) : (দেশ, কার্তিক - ফাল্গুন ১৩৪১)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩, পুস্তকালয়

২. রূপমঞ্জরী (বহুবচন) : (দেশ, আষাঢ় ১৩৫৩-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭, সাহিত্য প্রকাশন

৩. অক্ষরে অক্ষরে : (সোনার তরী, আশ্বিন ১৩৫৫)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, দিগন্ত পাবলিশার্স

৪. দূরভাষিণী (অকথিতা) : (গণবার্তা, ১৩৫৭-৫৮)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড

৫. গোধূলি : (সত্যযুগ, শ্রাবণ ১৩৫৭)
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬০, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৬. চেনামহল : (দেশ, ১৩৫৭-৫৮)
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬০, ক্যালকাটা বুক ক্লাব

৭. সঙ্গিনী : (দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৮)
প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬০ বেঙ্গল পাবলিশার্স

৮. দেহমন : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৯, বেঙ্গল-পাবলিশার্স

৯. অনুরাগিনী : (জনসেবক, পূজাসংখ্যা ১৩৬২)
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩, প্রকাশনীর উল্লেখ নেই

১০. সহৃদয়া : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩, ডি.এম.লাইব্রেরী

১১. শুক্লপক্ষ : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৪, ডি.এম.লাইব্রেরী

১২. সুখ দুঃখের ঢেউ : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৩. কথা কও : প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ় ১৩৬৬, বিংশশতাব্দী প্রকাশনী

১৪. উত্তর পুরুষ : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, ডি.এম.লাইব্রেরী

১৫. একটি নায়িকার উপাখ্যান : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭, ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৬. উপনগর : প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৭. পরম্পরা : প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯, গ্রন্থ প্রকাশ

১৮. তমস্বিনী (চিত্রলেখা) : (শারদীয়া কোন একটি সাময়িক পত্র ১৩৭০) প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৭১, সুরভি প্রকাশনী

১৯. পতনে উত্থানে : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭১, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

২০. সেতুবন্ধন : প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২১. দ্বৈতসঙ্গীত : প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১, মিত্র ও ঘোষ

২২. কন্যাকুমারী : প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৭২, বীরেন নাগ।

২৩. সূর্যসাক্ষী : (দেশ, ১৩৭১-৭২) প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২৪. উপচ্ছায়া : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭৩, মিত্র ও ঘোষ

২৫. দ্বন্দ্ব : শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩৭৭

২৬. সুরের বাঁধনে : প্রথম প্রকাশ : ৩০শে শ্রাবণ ১৩৭৮, মিত্র ও ঘোষ

২৭. জল মাটির গন্ধ : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

২৮. মহানগর : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, গ্রন্থ প্রকাশ

২৯. জলপ্রপাত : প্রথম প্রকাশ : ৭ই ফাল্গুন ১৩৮১, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৩০. দ্বিধা : উল্টোরথ, মাঘ ১৮৮১

৩১. হারানো মণি হারানো মন : তারিখ উল্লেখ নেই, কারেন্ট বুক সপ

৩২. তিনদিন তিনরাত্রি : দ্বিতীয় সংস্করণ : তারিখ উল্লেখ নেই, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩. অনমিতা : তারিখ উল্লেখ নেই, মিত্র ও ঘোষ

৩৪. মুখ প্রহর : দ্বিতীয় মুদ্রণ : তারিখ উল্লেখ নেই, গ্রন্থ প্রকাশ

৩৫. তৃষ্ণা : প্রথম প্রকাশ : ৭ই শ্রাবণ ১৩৯০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৩৬. চোরাবালি : প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯৩, অন্বেষা

অন্যান্য রচনা -

১. আত্মকথা : (দেশ, ১৩৮২) নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খন্ড, বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

২. গল্প লেখার গল্প : (বেতার জগত) নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খন্ড, বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ন ১৩৮৭, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৩. পিছে ফিরে দেখা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খন্ড
বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪. অন্য যা : ঐ

৫. বাবা : ঐ

৬. চাকলাদার : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খন্ড
বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৭. স্মৃতি : পরিচয় ২৬ বর্ষ ।। পৌষ ১৩৬৩ ।। ৪র্থ সংখ্যা

৮. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : কার্তিক, ১৮৭৯, ১৩৬৪, ৩রা ডিসেম্বর পরিচয়
-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'মাণিক স্মৃতি বর্ষ'
সভায় পঠিত।

কবিতা -

১. মুক : দেশ, ১৯৩৬ ১৬ই শ্রাবণ (১৩৪৩) প্রথম কবিতা

২. জোনাকি : (কানে কানে, প্রিয়া প্রশস্তি, স্মরণ, বিকাল,
বরষা, প্রশ্ন, আনমনা, ভাষা) প্রথম প্রকাশ :
চৈত্র ১৩৪৫, শ্রী সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এবং
শ্রী পরেশ মুখোপাধ্যায়

৩. নিরিবিলি : প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩, ক্যালকাটা বুক ক্লাব